মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আল্লাহ্‌র হক্ বান্দার হক্

আল্লাহ্‌র হক্‌

বান্দার হক্‌

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)

দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৯২১-০৯২৪৬৭ ০১৭৫-১৯১৪৭৭

আল্লাহ্র হক্ বান্দার হক্

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম ঃ জুলাই ১৯৮৮

৯প্রকাশ
এপ্রিল ঃ ২০০৯
চৈত্র ঃ ১৪১৫
রবিউল সানি ঃ ১৪৩০

প্রকাশক ঃ
মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
আবদুল্লাহ যুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তাফা কম্পিউটার্স
১০/ই-এ/১ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস, ২৬-তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

ISBN 984-8455-26-3

মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা

প্রসঙ্গ কথা

দুনিয়ায় মানুষের জীবন কতগুলো অধিকার ও কর্তব্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অধিকার ও কর্তব্যের তাকিদেই মানুষ বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করে, সুন্দরভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। জীবনে যদি অধিকার ও কর্তব্যের তাকিদ না থাকত, তাহলে মানুষের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। তার সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিও ভিন্ন অবয়ব ধারণ করত।

অধিকার ও কর্তব্যবোধ খানিকটা জন্মগত হলেও এর ব্যাপ্তি ও বিস্তারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। প্রধানত জীবনবোধের পার্থক্যের দরুনই এই মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। আর এ মতভেদই প্রতিটি সমাজ ও সভ্যতাকে আলাদা চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

ইসলামী জীবন-দর্শনে মানুষের অধিকার ও কর্তব্যকে 'হক্কুল্লাহ্' ও 'হক্কুল ইবাদ'—এই দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এর প্রথমটির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র হক্ তথা মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অধিকার। আর দ্বিতীয়টির মধ্যে রয়েছে বান্দার হক্ তথা মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার। আবার এই দুটি অধিকারের সাথেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে কর্তব্যবোধের প্রশ্ন। আল্লাহ্ মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' রূপে সৃষ্টি করেছেন, দুনিয়ায় তাকে প্রয়োজনীয় সব জীবন উপকরণ দিয়েছেন এবং তার জন্য একটি দ্বীন বা জীবন-যাপন পদ্ধতিও মনোনীত করেছেন। এই বিশেষ অনুগ্রহের জন্যে মানুষের কাছ থেকে আনুগত্য পাওয়া যেমন আল্লাহ্র একটি ন্যায়সঙ্গত অধিকার, তেমনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলাও প্রতিটি মানুষের নৈতিক কর্তব্য।

অনুরূপভাবে দুনিয়ায় মানুষ জন্মলাভ করছে পিতা-মাতার সৌজন্যে, বেড়ে উঠছে তাদের স্নেহ-বাৎসল্যে; এখানে সে জীবন-যাপন করছে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী এবং অন্য মানুষের সাহায্য সহযোগিতায়। অন্যদিকে মানুষের দুটি শ্রেণী—নর ও নারী—জীবনের পূর্ণতা খুঁজে পাচ্ছে দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে। সুতরাং এদের সকলেরই অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে পরস্পরের প্রতি। এই অধিকার ও কর্তব্যগুলো এমনি পরস্পর সম্পৃক্ত যে, এর কোন ক্ষেত্রে কিছুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি অনিবার্য। তাই অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে সঠিক ও সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা প্রতিটি মুসলমানের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

উপমহাদেশের খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) তাঁর এই গ্রন্থটিতে আল্লাহ্‌র হক্ ও বান্দার হক্ পর্যায়ে আমাদেরকে এক চমৎকার আলোচনা উপহার দিয়েছেন। জীবনের এই দুটি মৌলিক বিষয়ে আমাদের কার কতটুকু জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন, তার একটি সুন্দর রূপরেখা দেয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। পক্ষান্তরে এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানের দীনতা ও ধারণার অস্পষ্টতার ফলে আজকের মুসলিম সমাজ ইসলামী জীবন-দর্শনের কল্যাণকারিতা থেকে কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, তারও একটি পরোক্ষ জবাব দেয়া হয়েছে এতে। এদেশে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী করার সংগ্রামে যাঁরা নিবেদিত, তাঁদের জন্যে গ্রন্থটিতে রয়েছে প্রেরণার এক অন্তহীন উৎস।

এই অমূল্য গ্রন্থটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে এবং পাঠক মহলেও এটি সমাদৃত হয় বিপুলভাবে। এরপর গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নানা কারণে আজকে এ মূল্যবান গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্‌র অশেষ শোকরিয়া আদায় করছি। বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থটির মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা উন্নত করার ব্যাপারে আমরা পর্যাপ্ত যত্ন নিয়েছি। আশা করি, পাঠকদের কাছে এ সংস্করণটি পূর্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত হবে। আমরা এই মহান খেদমতের জন্যে গ্রন্থকারকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করার জন্যে মহান আল্লাহর কাছে সানুনয় আবেদন জানাচ্ছি।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন
২০৮, পশ্চিম নাখালপাড়া, ঢাকা

গ্রন্থকারের কথা

এই জগত এক মাত্র আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। মানুষ আল্লাহ্‌-সৃষ্ট বান্দা মাত্র। আল্লাহ্‌ই তাদেরকে জীবিকা দেন, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। মানুষ আরও বহু মানুষের সঙ্গে একত্রে লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়। ফলে মানুষের প্রথম ও মৌলিক সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে। আর তারই ভিত্তিতে দ্বিতীয় সম্পর্ক মানুষের সাথে। মানুষের ঔরসে, মানুষের গর্ভেই মানুষের সৃষ্টি। পরিবারে মানুষ পরিবেষ্টিত সমাজ পরিবেশেই মানুষ ভূমিষ্ঠ হয়। মানুষ সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌ এই নিয়মটিকেই কাজে লাগিয়েছেন। তাই মানুষের উপর যেমন আল্লাহ্‌র হক্‌—আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব অর্পিত, তেমনি মানুষের উপর মানুষের হক্‌—মানুষের প্রতি আল্লাহর কর্তব্য এবং দায়িত্বও অর্পিত ও অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়ায়!

কিন্তু বর্তমান মানুষ এই জাজ্জ্বল্যমান সত্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে বসেছে—ভুলে গিয়েছে। ফলে মানুষ যেমন আল্লাহ্‌র হক্‌—আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করে না, তেমনি মানুষের হক্‌—মানুষের প্রতি কর্তব্যও পালন করে না। পালন করে না—শুধু এতটুকু বললে প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা হয় না। বরং বলতে হয়, আজকের এ দুটি হক—এই দুটি কর্তব্য পালন করতে অস্বীকার করে বসেছে। ফলে মানুষ কঠিন গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

মানুষের উপর ধার্য হক্‌ ও অর্পিত কর্তব্য যেমন দ্বিবিধ, তা পালন না করা—পালন করতে অস্বীকার করার দরুন মানুষের গুনাহ্‌-ও দ্বিবিধ—দুই পর্যায়ের। একটি গুনাহ আল্লাহ্‌র হক্‌ আদায় না করা—তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন না করার দরুন। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের গুনাহ্‌ মানুষের হক্‌ আদায় না করা—তার প্রতি আরোপিত কর্তব্য পালন না করার ফলে হয়ে থাকে। তবে দুনিয়ায় যেসব গুনাহের দরুন এক-একটি জাতি–জনগোষ্ঠীর উপর আল্লাহর ক্রোধ-অসন্তুষ্টি ও রোষ-আক্রোশ—আকর্ষিত হয়, অন্যান্য মানুষের হক্‌ উপেক্ষিত ও পদদলিত হওয়া—তাদের প্রতি কর্তব্য পালন না করার দরুনই হয়ে থাকে। কুরআন মজীদ ও হাদীস থেকে একথা নিঃসন্দেহে জানা যায়।

আসল কথা কোন্‌ সব বদ্‌-আমলের দরুন জনসমষ্টির উপর কোন্‌ ধরনের আযাব আসে, তা এক গভীর রহস্য, সন্দেহ নেই। সে রহস্য উদ্‌ঘাটন আল্লাহ্‌র

নবী ও রাসূলগণ ছাড়া অন্য কারোর অধিকারে থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর গায়েব ও দুর্জ্ঞেয় রহস্য তাদেরকেই জানিয়ে থাকেন, যতটা তিনি ইচ্ছা করেন। রাসূলে করীম (স) এই পর্যায়ে বহু কথা প্রকাশ করেছেন।

বর্তমান দুনিয়ার মানুষ সাধারণভাবে এবং বিশেষত, মুসলিম সমাজের অবস্থা অবলোকন করলে এতে আর কোনই সন্দেহ থাকে না যে, তারা উভয় প্রকারের গুনাহে ব্যাপক ও কঠিনভাবে লিপ্ত। আল্লাহ্র অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকৃত। জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে তাঁকে উৎখাত করা হয়েছে। মানুষের প্রতি চরম অবজ্ঞা ও নির্মমতা প্রদর্শিত হচ্ছে; অকারণে হত্যা করা হচ্ছে, ইজ্জত-আবরু ও ধন-মাল লুণ্ঠন করা হচ্ছে। অসহায় নারী—এমন কি বাচ্চা মেয়ে ধর্ষিত হচ্ছে, ধর্ষণের পর তাকে হত্যা করে ফেলে দেয়া হচ্ছে।—একাকীও করা হচ্ছে, করা হচ্ছে দলবদ্ধভাবে। স্বামী স্ত্রীকে মারছে, স্ত্রীও হত্যা করছে স্বামীকে। এমন কি পিতা বা জননী নিজের সন্তানকে এবং সন্তান পিতা বা মাতাকে হত্যা করতেও দ্বিধা করছে না—পারস্পরিক হক্ আদায় ও কর্তব্য পালন করা তো দূরের কথা।

আমার বর্তমান গ্রন্থটি দেশবাসীকে ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই লিখিত। আমার অন্তরের একমাত্র কামনা, মানুষ প্রথমে আল্লাহ্র হক্ আদায়ে—আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে সচেতনভাবে তৎপর হোক, তার সাথে সাথে মানুষের হক্ আদায়ে—মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনে সচেতনভাবেই সক্রিয় হোক।

২১-৭-৮৭ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

সূচীপত্র

মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা এবং তার পরিবেশের অসংখ্য জিনিসের হক বা অধিকারের বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

انَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِبَدَ نِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ
حَقًّا وَلِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ -

(بخ ري – عن سلمان الفر سى)

নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের, তোমার শরীরের, তোমার স্ত্রীর, তোমার সন্তানের হক্ রয়েছে অতএব প্রত্যেক হক্‌দারকে তার হক্ প্রদান কর। (বুখারী, সালমান ফারসী থেকে বর্ণিত)।

শুরু কথা

'হক্কুল্লাহ' ও 'হক্কুল-ইবাদ'-এ দুটি বাক্য মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এবং প্রচলিত। প্রথমটির অর্থঃ আল্লাহ্‌র হক্ বা অধিকার এবং দ্বিতীয়টির অর্থঃ বান্দার হক্ বা অধিকার। এ দুটি কথার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষের উপর আল্লাহ্‌র হক্ রয়েছে যেমন, তেমনি বান্দারও হক্ রয়েছে বান্দার নিজের উপর এবং অন্যান্য বান্দার উপর, যা অবশ্যই আদায় করতে হবে।

'হক্ (حق) শব্দটি কুরআন মজীদে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, ব্যবহৃত হয়েছে হাদীসেও। এ শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সত্য, প্রমাণিত, অনস্বীকার্য। যা স্বাভাবিকভাবে সত্য, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমাণিত এবং যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমাণিত, তা অনস্বীকার্য। আর যা অনস্বীকার্য, তা অবশ্যই আদায় করতে হবে, তা আদায় না করে কোন উপায় নেই, কোন উপায় থাকতে পারে না। কেননা যা স্বাভাবিকভাবে সত্য, তা কে অস্বীকার করতে পারে? তা তো অনিবার্যভাবে মেনে নিতে হবেই। তা অস্বীকার করার বা আদায় না করার কোন অধিকারই কারোর থাকতে পারে না।

বাংলা ভাষায় এই 'হক্' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা বলি 'অধিকার'। আর 'অধিকার' বলতে এক সাথে দুটি জিনিস বোঝায়। একটি হচ্ছে 'স্বত্ব' যা ব্যক্তির নিজের জন্য প্রযোজ্য। আর অপরটি অন্যের উপর ধার্য, অন্য কারোর নিকট পাওনা (Right)।

নিজের স্বত্ব নিজের নিকট স্বীকৃতব্য। অন্যকেও তা মেনে নিতে হয় এবং সে জন্য কোন ব্যক্তির স্বত্বের উপর কারোর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। আর যা অন্যের নিকট পাওনা, তা যার পাওনা তাকে সে ব্যাপারে যেমন সচেতন থাকতে হবে সে পাওনা আদায় করার জন্য, তেমনি যার নিকট তা পাওনা, তাকে সে পাওনার কথা মানতে হবে। তা সে অস্বীকার করবে না, শুধু তা-ই নয়, তা দিয়ে দেওয়ার জন্যও তাকে মনে প্রানে প্রস্তুত থাকতে হবে; আর সে প্রস্তুতির ফলশ্রুতিতে তা অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে। না দিলে সে কঠিনভাবে দায়ী হবে।

'অধিকার' কথাটি পারস্পরিক। আমার অধিকার তার উপর এবং তার অধিকার আমার উপর। সেই সাথেই আমার অধিকার আমার নিজের উপর। পারস্পরিক এই অধিকারের ন্যায্যতা কোন মানুষই অস্বীকার করতে পারে না।

'স্বত্ব' যেমন ব্যক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, তেমনি 'অধিকার' সেই স্বত্বাধিকারী ব্যক্তিগণকে পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত, সংযোজিত ও সুসংবদ্ধ করে। 'স্বত্ব' ব্যক্তিবাদ সৃষ্টি করে। আর অধিকার সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করে। এই ব্যক্তিত্ব ও সামাজিকত্ব-এর সমন্বয়েই মানুষের বাস্তব জীবন।

'হক্' বা অধিকারের সহিত 'কর্তব্য' শব্দটির সম্পর্ক ওতপ্রোত। কেননা একজনের যা 'হক্' বা অধিকার, অন্যজনের জন্য তা কর্তব্য। একজনের যা 'পাওনা' অন্যজনের জন্য তা দেনা। আর 'দেনা' মানেই 'দেওয়া কর্তব্য'। এভাবে মানুষ স্বত্ব তথা অধিকার ও দেনা অর্থাৎ কর্তব্যের বন্ধনে বন্দী। এই বন্ধন ছিন্ন করা হলে মানুষের জীবন চলতে পারে না।

মানুষ প্রথমে একটি ব্যক্তিসত্তা। অতএব তার, একটা স্বত্ব থাকা আবশ্যক। ব্যক্তির সত্তা যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি অস্বীকার করা যায় না ব্যক্তিস্বত্বকেও। কিন্তু ব্যক্তির সত্তা যতই স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন হোক, তা কোন ক্রমেই অন্য নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই ব্যক্তির স্বত্বও অন্য নিরপেক্ষ নয়। তারও একটা সামষ্টিক দিক রয়েছে। যেমন ব্যক্তির সত্তা-স্বাতন্ত্র্যের রয়েছে সামাজিক পটভুমি। সমাজ সামষ্টিকতাকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির জীবন অকল্পনীয়।

স্বত্ব নিয়ে আসে দায়িত্ব, আর অধিকার নিয়ে আসে কর্তব্য। তাই এই দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বাদ দিয়ে বা দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে মানব-সত্তা সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বিশ্লেষণ ও মুল্যায়ন হতে পারে না।

পৃথিবীর বুকে মানব সত্তার মূল্যায়নে প্রাথমিক ও স্বতঃস্পষ্ট কথা হচ্ছে, মানুষ একটা সৃষ্টিসত্তা। সৃষ্টের জন্য অপরিহার্য স্রষ্টা। তাই সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে প্রথমেই স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করে নিতে হবে। কেননা স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির অস্তিত্ব কোনক্রমেই সম্ভব বলে মনে করা যেতে পারে না।

মানুষের স্রষ্টা শুধু মানুষের স্রষ্টাই নন্, তিনি পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টিলোকেরই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি সৃষ্টি করেছেন বলেই মানুষের জন্ম ও জীবন সম্ভব হয়েছে। না, তিনি সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি, মানুষকে শুধু সৃষ্টিই করেন নি; এই দুনিয়ায় মানুষের বেঁচে থাকার ও জীবন ধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রথম মানুষটিকে তিনি নিজ দয়াতে স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করলেও পরবর্তী মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমে, সে কথাও কোনক্রমেই ভুলে যাওয়া যেতে পারে না।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, মানুষের জীবনে সৃষ্টিকুল ও পিতা-মাতার অস্তিত্ব এবং এতৎ সংশ্লিষ্ট সব মানুষের সহিত তার অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং এই সব

দিকের সম্পর্ক সমন্বিত মানুষেরই মূল্যায়ণ যথার্থ হতে পারে। মহান সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন সর্বাগ্রে, সর্বপ্রথমে ও সব কিছুর মূলে। কেননা তিনি যদি আদৌ সৃষ্টি কর্মই না করতেন, যদি এই বিশাল বিশ্বলোক—এই পৃথিবী সৃষ্টি না করতেন, পৃথিবীকে মানুষের জীবন যাপন উপযোগী করে মানুষের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য দ্রব্য সামগ্রী উপায়-উপকরণে ভরপুর করে সৃষ্টি না করতেন এং তিনি যদি পিতা ও মাতাকে সৃষ্টি না করতেন, তাহলে মানুষের অস্তিত্বই সম্ভব হতো না। তাই প্রথমে সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ, তারপর বিশ্বলোক ও পৃথিবীর অবদান এবং তৃতীয়ত পিতা-মাতার স্নেহ-বাৎসল্য সন্তান লাভের আগ্রহ আবেগ মানব জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

অনুগ্রহ, অবদান ও স্নেহ-বাৎসল্যের দাবি অস্বীকার করা চরম অকৃতজ্ঞতার ব্যাপার। আর কৃতজ্ঞতা মানুষের সহজাত বিবেচনাই প্রশংসনীয়, আর অকৃতজ্ঞতা একটা বড় অপরাধ। অকৃতজ্ঞতা সাধারণভাবেই মানুষের নিকট ঘৃণিত—কোন দিনই তার প্রশংসা করা হয়নি। অতএব মহান স্রষ্টার অনুগ্রহ, বিশ্বলোক ও পৃথিবীর অবদান এবং পিতা-মাতার এবং পিতা-মাতার স্নেহ-বাৎসল্য ও কষ্ট স্বীকারের ঐকান্তিক দাবি হচ্ছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার। ফলে মানুষের উপর সৃষ্টিকর্তার হক্‌, বিশ্বলোক ও পৃথিবীর হক্‌ ও পিতা-মাতার হক্‌—সর্বোপরি তার নিজের উপর নিজের হক্‌ এক অনস্বীকার্য মহাসত্য। এই হক্‌-ই মানুষের কর্তব্য নির্ধারণ করে। মানুষের উপর যার যা হক্‌—অধিকার, তার প্রতি তা-ই তার কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করা—অন্য কথায় এই হক্‌ আদায় করা-ই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। মানুষ যদি এই কর্তব্য পালন করে, তাহলে সে প্রকৃত মানুষ হওয়ার গৌরবে ধন্য হতে পারে। তার জন্ম ও জীবন হতে পারে সার্থক। আর তা যদি সে না করে তাহলে সে চিহ্নিত হবে অতি বড় অকৃতজ্ঞ হিসেবে। অকৃতজ্ঞ তো সকল কালে সকল সমাজে চরমভাবে ঘৃণিত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

আল্লাহ্‌র হক্‌—আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্য

তাই সর্বপ্রথম আলোচিতব্য হচ্ছে মানুষের উপর মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার হক্। অন্য কথায়, সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের কর্তব্য।

এই পর্যায়ে মানুষকে স্বীকার করতে হবে, সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত এই বিশ্বলোক—এই পৃথিবীর অস্তিত্বই সম্ভব হতো না। আর তাহলে মানুষের অস্তিত্বেরও কোন প্রশ্নই উঠে না।

সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনি এক, একক ও অনন্য। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া যেমন কোন সৃষ্টির কল্পনা করা যায় না, তেমনি একাধিক সৃষ্টিকর্তাও অকল্পনীয়। আর যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই তাঁর সৃষ্টির একক পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী। সে ক্ষেত্রেও অন্য কারোর একবিন্দু অংশীদারিত্ব স্বীকৃতব্য নয়। কুরআন মজীদের ঘোষণা হচ্ছেঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ-اَللّٰهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ- (الا خلاق .)

বল হে নবী। সেই সৃষ্টিকর্তা (যার প্রয়োজন অপরিহার্য অনস্বীকার্য) আল্লাহ্। তিনি এক, একক, অনন্য। সেই আল্লাহ্ পরমুখাপেক্ষীহীন—সকলেই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। তিনি জন্ম দেন না, তিনি জাত নন। তাঁর সমতুল্য কেউ কোথাও নেই।

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَ تَاج فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ- (الا نبيا ء-٢٢)

আসমান ও যমীনে যদি একাধিক ইলাহ্ হতো, তাহলে ও-দুটি বিপর্যস্ত চুরমার হয়ে যেত। অতএব লোকেরা (অবাঞ্ছনীয়-অশোভন) যা কিছু বলে তার পরিচয় দেয় সেই সব কিছু থেকে আল্লাহ্ সর্বতোভাবে মুক্ত পবিত্র। তিনিই আরশ (ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুর) অধিকারী।

এভাবে আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের সর্বশেষ কালামে নিজের যে পরিচিতিই দিয়েছেন, সেই পরিচিতি সহকারেই তাঁকে মেনে নেওয়া আল্লাহ্‌র হক্‌—মানুষের কর্তব্য। সে পরিচিতিতে কোনরূপ রদ্‌-বদল বা বিকৃতির প্রশ্রয় দেয়ার কোন অধিকার মানুষের নেই। তা করা হলে তা হবে মানুষের চরম অকৃতজ্ঞতা। আর কুরআনের ভাষায় তা হবে সুস্পষ্ট শির্‌ক। কিন্তুঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا- (النساء-١١٦)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমা করেন না তাঁর সহিত শির্‌ক করা হলে। তার অপেক্ষা কম গুনাহ্‌ যার জন্যই তিনি চাইবেন, ক্ষমা করে দেন। বস্তুত যে-ই আল্লাহ্‌র সহিত শির্‌ক করে, সে চরমভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, বুঝতে হবে।

আল্লাহ্‌ আছেন, তিনিই সব কিছুরই একক ও অনন্য সৃষ্টিকর্তা—এই পরিচিতি সহকারে তাঁকে স্বীকার করা ও মেনে নেয়াই বান্দার কর্তব্য, আর তা-ই বান্দার উপর আল্লাহ্‌র উপর আল্লাহ্‌র অনস্বীকার্য 'হক্‌'।

আল্লাহ্‌ই এই বিশ্বলোকের একমাত্র স্রষ্টা। কিন্তু তিনি এই বিশ্বলোক সৃষ্টি করলেন কেন? একক সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তিনি নিজেই তার জবাব দিয়েছেনঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ- اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقره-٢١-٢٢)

হে জনগণ! তোমরা দাস হয়ে থাক তোমাদের সেই রব্ব্‌-এর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদেরকে, তা হলে আশা করা যায় যে, তোমরা রক্ষা পেতে পারবে। তোমাদের রব্ব তো তিনি যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসোপযোগী শয্যা এবং আকাশমণ্ডলকে দৃঢ় সংস্থাপন বানিয়েছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষিয়েছেন, তার সংমিশ্রণে তোমাদের রিযিক স্বরূপ ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বানিও না। কেননা তোমরা জান যে, তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, থাকতে পারে না।

আল্লাহ্‌ই সৃষ্টিকর্তা, তাঁর শরীক কেউ নেই। তিনি এক ও একক। তিনিই বিশ্বলোকের ক্ষমতা-কেন্দ্রের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনিই বিশ্বলোকের একক স্রষ্টা ও পরিচালক। এর নিয়ন্ত্রণ নিরংকুশভাবে তাঁরই ইচ্ছাধীন। এই বিশ্বলোক এই পৃথিবীকে এবং এখানকার সব কিছুকে তিনি-ই সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য, এই দুনিয়ায় সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করার সুবিধা লাভের জন্য।

বস্তুত মানুষের সৃষ্টি মুহূর্ত থেকে শুরু করে তার সমগ্র জীবন এই দুনিয়া এই প্রকৃতির মৌল উপাদান, শক্তি উপকরণ, প্রাকৃতিক নিয়ম রীতি এবং এখানকার বিধি ব্যবস্থা—বৃষ্টিপাত ও ফল-মূলের উৎপাদন কেবলমাত্র মানুষেরই সামষ্টিক কল্যাণের জন্য।

এই পর্যায়ে স্মরণ করা যেতে পারে প্রথম মানুষ আদম সৃষ্টির কথা। আদম এই যমীনে প্রথম মানুষ, দুনিয়ার সব মানুষের আদি পিতা। তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ

اَلَّذِيْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ- ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ- (السجده- ٧-٩)

সেই মহান স্রষ্টা প্রত্যেকটি জিনিসের সৃষ্টিকর্ম অত্যন্ত উত্তম ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন। আর মানুষের সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর তিনি তার বংশের ধারা চালিয়েছেন নিকৃষ্ট তরল পানির নিংড়ানো নির্যাস থেকে। পরে তাকে পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ অবয়ব সম্পন্ন বানিয়েছেন। তাতে তাঁর রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন। আর তোমাদের শ্রবণ দৃষ্টির অঙ্গ ও দিল বানিয়ে দিয়েছেন। ... আসলে তোমরা খুব কম-ই শোকর করে থাক।

মানব সৃষ্টির সূচনা—অন্য কথায় প্রথম মানুষটির সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। ঠিক মাটি দিয়ে নয়, পানি মিশ্রিত কাদা মাটি দিয়ে। মাটিতে যত মৌল উপাদান আছে, তার সব কিছুর সারনির্যাস দিয়েই প্রথম মানুষটিকে সৃষ্টি করেছেন।[1] আল্লাহ্‌র ঘোষণা অনুযায়ী তিনি তাকে (ص-٧٥) - خلقت بيدى নিজ হস্তে

১. মানব দেহের রাসায়নিক বিশ্লেষণে যে সব মৌল উপাদান পাওয়া যাবে, মাঁটির রাসায়নিক বিশ্লেষণেও ঠিক সেই মৌল উৎপাদনই মিলবে। অতএব মানব দেহ যে মাটি—মাটির মৌল উপাদান দিয়ে সৃষ্টি, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা অকাট্য সত্য। (গ্রন্থকার)

(প্রত্যক্ষভাবে) সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অতঃপর মানুষ-সৃষ্টির ধারা চলেছে বংশানুক্রমিকভাবে। সে সৃষ্টির মৌল উপকরণ হচ্ছে নিকৃষ্ট পানি নিংড়ানো সারনির্যাস। আল্লাহ্‌ তা পুরুষের দেহে স্বাভাবিক নিয়মে সৃষ্টি করেন। মানুষ যা কিছু আহার করে, তা সবই মৌলিক ও প্রাথমিকভাবে মাটির উপাদান। তাতে মাটির মধ্যে নিহিত সব উপরকরণের সারনির্যাস এসে যায়। মানুষ যে খাদ্য হজম করে, তা থেকে আবর্জনা একদিকে নিষ্কাশিত হয়ে যায়, অপরদিকে রক্ত তৈরী হয়। এই রক্ত থেকেই বীর্য বা শুক্র তৈরী হয়। পুরুষ দেহে থেকে এই শুক্র নারী গর্ভে নিহিত ডিম্বকোষে প্রবেশ করেই মানব সত্তার উন্মেষ ঘটে ভ্রুণ আকারে। তা হয় মানবীয় পূর্ণাঙ্গ আকার-আকৃতি সম্পন্ন। অতঃপর তাতে আসে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে রূহ্‌। নারী গর্ভে প্রবিষ্ট শুক্রকে মানবাকৃতি ধারণের জন্য কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়, যেমন আল্লাহ্‌ই ইরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ - ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ - (المؤمنون - ١٢-١٤)

আমরা মানুষকে মাটির সার থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তাকে এক বিশেষ স্থানে টপকানো ফোটায় পরিবর্তিত করেছি। অতঃপর এই ফোটাকে জমাট বাধা রক্তে পরিণত করেছি। এরপর এই জমাট বাধা রক্তকে মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত করেছি। তার মধ্যেই অস্থি-মজ্জা বানিয়েছি। এই অস্থি-মজ্জার উপর গোশ্‌ত বসিয়ে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাকে অপর সৃষ্টির রূপ দিয়ে দাঁড় করে দিয়েছি। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, অতীব বরকত সম্পন্ন হচ্ছেন আল্লাহ্‌ যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা।

স্পষ্ট জানা গেল, প্রথম মানুষ আদমকে কাদা মাটি—আঠালো মাটি منطين لازب দিয়ে আল্লাহ্‌ প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি করেছিলেন পিতা-মাতা ছাড়াই।

কিন্তু অতঃপর মানুষের বংশধারা চলেছে মানুষের ঔরসজাত-গর্ভজাত সন্তান হিসাবে। তাতে যে মৌল উপাদান লাগনো হয়েছে, তাও মাটিরই সারনির্যাস। মানুষ খাদ্য হিসাবে এই পৃথিবীর যে ফল-ফসল ও মাছ-গোশ্‌ত তরকারী-সবজি ইত্যাদি আহার করে, তা থেকেই সেই মৌল উপাদান—শুক্র তৈরী করা হয় আল্লাহ্‌র চালু করা এক চিরন্তন নিয়মে। তা-ই নারীর গর্ভের এক সুরক্ষিত স্থানে

দৃঢ়ভাবে স্থিতি গ্রহণ করে। তা জমাট বাধা রক্ত ও মাংসপিণ্ডের স্তর অতিক্রম করে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ—এক নবতর সৃষ্টি-সত্তারূপে শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে। এতে একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ম আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই প্রকৃতির উৎপাদন ও উপকরণ। মানুষের দেহসত্তা গঠনের এটাই ইতিহাস। এই দেহ সত্তায় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে 'রূহ' এসে স্থিতি গ্রহণ করলেই মানুষ একটি পূর্ণাঙ্গ সঞ্জীবিত সত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাহলে মানুষের একটি জীবন্ত সত্তায় পরিণত হওয়ার মূলে মাটি, প্রাকৃতিক উপাদান, আল্লাহ্‌র দেয়া রূহ্ এবং পিতা ও মাতার অস্তিত্ব এবং এসবের পূর্ণ মাত্রায় সহযোগিতা অপরিহর্য হয়ে রয়েছে। তাই মানুষ এই সবের নিকটই অনুগৃহীত, কিন্তু সবচাইতে বেশী ও মৌলিকভাবে অনুগৃহীত আল্লাহ্‌র নিকট। কেননা এই মাটি, পানি, এই প্রকৃতি পিতা-মাতা ও রূহ সবকিছুরই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হচ্ছো মহান আল্লাহ্। সেই আল্লাহ্‌রই 'হক্' মানুষের উপর সর্বপ্রথম, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সম্পূর্ণরূপে মৌলিক। অতএব মানুষকে সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞ হতে হবে আল্লাহ্‌র প্রতি। মাটি ও প্রকৃতির অবদানকেও স্বীকার করতে হবে তাকে এবং অতি নিকটবর্তী অনুগ্রহকারীরূপে মেনে নিতে হবে পিতা মাতার অনুগ্রহকে।

আল্লাহ্‌র ঘোষণা অনুযায়ী এই আসমান-যমীন এবং এর মধ্যে যেখানে যা কিছু আছে সবই মানুষের জন্য, মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য। এসব না হলে এখানে মানুষের অস্তিত্ব ও জীবনে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। আর তার অস্তিত্ব সম্ভব হতো না পিতা ও মাতা না হলে। অতএব এই সবের প্রতিও মানুষের কর্তব্য রয়েছে। মানুষের এই কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত হয়, আল্লাহ্‌র 'হক্' পৃথিবী ও প্রকৃতির 'হক্' এবং পিতা ও মাতার 'হক্'। এই সকলের 'হক্' যার যতটা এবং যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা ততটা ও ততটা গুরুত্ব সহকারেই আদায় করতে হবে। তবে সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথম আদায় করতে হবে আল্লাহ্‌র হক। আল্লাহ্‌র হক্ই হচ্ছে অন্যান্য সকলের 'হক্' ধার্য হওয়ার ভিত্তি। ভিত্তি না থাকলে যেমন প্রতিষ্ঠান থাকে না, তেমনি আল্লাহ্‌র 'হক্' সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আদায় করা না হলে অন্য কারোরই 'হক্' আদায় হতে পারে না। যে লোক আল্লাহ্‌র 'হক্' আদায় করে না, সে আসলে আর কারোরই 'হক্' আদায় করতে পারে না।

আল্লাহ্‌র খালেস ইবাদত

মানুষ আল্লাহ্‌র 'হক্' কিভাবে আদায় করবে? আল্লাহ্‌র নিজের ঘোষণা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র 'হক্' আদায় করতে হবে সর্বপ্রথম তাঁর অস্তিত্ব ও তাঁর প্রতি

মনেপ্রাণে ও পূর্ণমাত্রায় কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁরই ইবাদত করে। কেননা আল্লাহ্ এই উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ - مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ- اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ -

(الذاريت - ٥٦-٥٨)

জিন ও মানুষকে আমি কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তারা স্বত উদ্যোগী হয়ে কেবল আমারই ইবাদত করবে। আমি তো তাদের নিকট কোন রিযিক পেতে চাই না, চাই না তারা আমাকে খাওয়াবে। মূলত আল্লাহ্ই তো হচ্ছেন মহা রিযিকদাতা, সুদৃঢ় শক্তির অধিকারী।

'তারা আমারই ইবাদত করবে' অর্থ আনুগত্য করবে, দাসত্ব স্বীকার করবে, ইবাদতের অনুষ্ঠানাদি পালন করবে, তাঁর নিকট নতি ও অপদস্থতা স্বীকার করবে, তাঁরই নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করবে এবং এইসব সহকারে আল্লাহ্‌র একান্ত দাস-দাসানুদাস হয়ে জীবন যাপন করবে। এই দুনিয়ায় মানুষের একজন মনিব—প্রভু থাকা আবশ্যক। আল্লাহ্ই হবেন মানুষের সেই একমাত্র মনিব ও প্রভু। এমন এক মহাশক্তিমান সত্তার প্রয়োজন, যিনি মানুষকে রিযিক দেবেন এবং মানুষ যার নিকট থেকে রিযিক পাওয়ার আশা করবে, যার নিকট মানুষ আত্মসমর্পণ করবে, বিনয়াবনত হয়ে হীনতা ও নীচতা স্বীকার করবে। আল্লাহ্ই হবেন সেই একমাত্র সত্তা। মানুষের জন্য এমন এক মহাজ্ঞানী সর্বদর্শী বিধানদাতার প্রয়োজন, যাঁর বিধান অনুযায়ী সে জীবন যাপন করতে ও জীবনের সকল কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। আল্লাহ্-ই হবেন মানুষের জন্য সেই একমাত্র বিধানদাতা। মানুষের জন্য এমন এক মহান সত্তার প্রয়োজন, যার সমীপে সে নিজেকে সোপর্দ করে দিতে ও যার আনুগত্য করে চলতে পারবে। আল্লাহ্ই হচ্ছেন সেই সত্তা। মানুষের জন্য এমন এক পবিত্র মহান সত্তার প্রয়োজন যার সন্তুষ্টি অর্জনই হবে এই দুনিয়ার মানুষের জন্য একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, যাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করবে তার সকল কাজ ও তৎপরতার মাধ্যমে। আল্লাহ্ই হবেন মানুষের জন্য সেই একমাত্র সত্তা। বস্তুত এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সচেতনভাবে স্বত উদ্যোগী আগ্রহী হয়েই আল্লাহ্কে এভাবে বরণ করে নেবে। মানুষ ছাড়া সৃষ্টিলোক এভাবে আল্লাহ্কে মেনে নেয়ার—বরণ করে নেয়ার গুণসম্পন্ন আর কোন সৃষ্টি নেই। ফেরেশতা সে রকমের সৃষ্টি নয়। কেননা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে তাদের রয়েছে সৃষ্টিগত বাধ্যবাধকতা রূপে। পৃথিবী ও

বিশ্বলোকের সব কিছুই আল্লাহ্‌র নিয়মে বাঁধা, আল্লাহ্‌র অনুগত বটে, কিন্তু সে সবের কোনটির মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্ততা ও উদ্যোগ আগ্রহের ভাবধারা নেই। তাই আল্লাহ্‌কে উক্তভাবে মেনে নেয়া—গ্রহণ করা মানুষের উপর আল্লাহ্‌র 'হক্‌'। আর তাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব। কেননা আল্লাহ্‌ তো মানুষের নিকট কোন বস্তুগত জিনিস চান না। তিনি এই সবের প্রয়োজনের অনেক উর্ধ্বে, সকল প্রকার মুখাপেক্ষিতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁকে মানুষ রিযিক দেবে, খাওয়াবে, তার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এমন কি মানুষ মানুষের রিযিকদাতা হবে, মানুষ মানুষের খাদ্যদাতা হবে, তাও সম্পূর্ণ অর্থহীন। কেননা প্রকৃত রিযিকদাতা তো একমাত্র আল্লাহ্‌ই। তিনিই সকল জীবন ও প্রাণীর জন্য একমাত্র রিযিকদাতা। (ইবনে আব্বাস ও আবদুল জাওজা, ইমাম কুরতবী)

বস্তুত এভাবে আল্লাহ্‌কে মেনে নিয়ে, নিজকে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র দাস বানিয়ে আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ বিধান—তাঁর যাবতীয় হুকুম-আহ্‌কাম পালনের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র 'হক্‌' আদায় করা সম্ভব।

একমাত্র আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে মানুষ জীবন যাপন করবে, এটা মানুষের উপর আল্লাহ্‌র 'হক্‌'। আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের প্রধান প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এই 'হক্‌' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা 'ইবাদত' নিছক কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়। কতিপয় নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পালন করলেই আল্লাহ্‌র ইবাদত হয়ে যায় না। নির্দিষ্ট কয়েকটি সময়ের মধ্যেও তা সীমাবদ্ধ নয়। তা মানুষের সমগ্র জীবনের ব্যাপার। যার সূচনা হয় মানুষের মন-অন্তর ও হৃদয় থেকে। মানুষের মন-অন্তর হৃদয়ে ভয়, আশংকাবোধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা-নির্ভরতা হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি। মানুষ আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকেই নয়। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاِيَّایَ فَارْهَبُوْنِ- (البقرة -٤٠- النحل -٥١)

এবং কেবলমাত্র আমাকেই তোমরা ভয় কর।

رهب ও رهبة অর্থ অন্তরের অসীম অস্থিরতা ও উদ্বেগ সহকারে ভয় করা। আয়াত অনুযায়ী এই ভয় কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতিই রাখতে হবে, কেবল তাঁকেই এভাবে ভয় করতে হবে। এইরূপ ভয় আল্লাহ্‌ ছাড়া কারোর প্রতিই পোষণ করা যাবে না। বান্দার উপর আল্লাহ্‌র এ এক বিশেষ 'হক্‌'।

وَاِيَّا یَ فَاتَّقُوْنِ (البقرة-٤١)

এবং একমাত্র আমার ভয় পোষণ করে নিজেকে আমার আযাব থেকে রক্ষা কর।

ভরসা নির্ভরতাও এই ইবাদতেরই অংশ। মানুষ যার ইবাদত করে, তারই উপর ভরসা করবে, এটাই স্বাভাবিক। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র 'হক্‌' হচ্ছে, মানুষ কেবল তাঁরই ইবাদত করবে। অতএব কেবল তাঁরই উপর ভরসা করা, নির্ভরতা গ্রহণ করাও মানুষের উপর আল্লাহ্‌র 'হক্‌'। তাই বলা হয়েছেঃ

وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ - (يوسف - ٦٧)

কেবলমাত্র সেই আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করবে—নির্ভর করবে সব নির্ভরকারী লোকগণ।

এই ভয় অন্তরের অসীম অস্থিরতা উদ্বেগ, আযাব ও দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের জীবন, তা-ই ইবাদতের জীবন। এই ইবাদতের জীবন অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্‌ঃ

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ-
(العنكبوت - ٥٦)

হে আমার সেসব বান্দা, যারা ঈমান গ্রহণ করেছ, তোমরা জানবে, আমার এই পৃথিবী অতীব প্রশস্ত, বিশাল। অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করবে।

বস্তুত এইরূপ ইবাদত-ই আল্লাহ্‌র কাম্য। মানুষ আল্লাহ্‌র এইরূপ ইবাদত করবে, এটাই মানুষের উপর আল্লাহ্‌র 'হক্‌'। এইরূপ ইবাদত করেই মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি তার কর্তব্য পালন করতে পারে।

সূরা আয্‌-যারিয়াত-এর পূর্বোদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেছেন, তিনি মানুষের নিকট রিযিক চান না। বরং আল্লাহ্‌ই মানুষের একমাত্র রিযিক দাতা। অতএব রিযিকদাতা হিসেবে মানুষ আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকেই মেনে নেবে না, আর কারোর নিকটই রিযিক চাইবে না। আর রিযিক মানে 'জীবিকা'। জীবিকা বলতে সেই সব কিছুকেই বোঝায়, যে সবের উপর মানুষের এই জৈবিক বৈষয়িক জীবন নির্ভর করে। তাহলে আল্লাহ্‌ মানুষের শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন, মানুষের জীবনে বেঁচে থাকাও একান্তভাবে নির্ভর করে একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর। তাই মানব জীবনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনও সম্পন্ন হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে।

সমগ্র জীবনের উপর একমাত্র আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা, কার্যকর করা—আল্লাহ্‌ ছাড়া জীবনে—জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রেও অন্য

কারোরই একবিন্দু কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে না নেয়া, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর কোন আদেশ-নিষেধ বা আইন-বিধান মেনে না নেয়াই মানুষের উপর আল্লাহ্‌র 'হক্'। তাই মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক—সমগ্র ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে, তারই দেয়া আইন-বিধান অনুযায়ী সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে ও সেই অনুযায়ী চলে এবং চালিয়ে আল্লাহ্‌র 'হক্' আদায় করতে হবে।

মুখে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, একত্ব ও অসীম অনুগ্রহের কথা স্বীকার করে বাস্তব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান অগ্রাহ্য করা হলে আল্লাহ্‌র 'হক্' আদায় করা যাবেনা, শুধু তাই নয়, সেরূপ করা হলে আল্লাহ্‌র অপমান করা হবে। তা করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নয়, আল্লাহ্‌র রোষ ও আক্রোশকেই আহ্বান করা হবে। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও বান্দার বন্দেগী স্বীকার পর্যায়ে আল্লাহ্‌র ঘোষণা দৃঢ়, অকাট্যঃ

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ - (يوسف - ٤٠)

হুকুম দেওয়ার চূড়ান্ত—একমাত্র অধিকার, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য। তিনিই ফরমান দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর জন্য আর কারোরই দাসত্ব-অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করবে না। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও দাসত্ব ভিত্তিক দ্বীন-ই, দৃঢ় সরল। কিন্তু লোকদের অনেকেই তা জানে না।

অতএব মনে ও মুখে আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে তাঁর আইন-বিধান পালন করা আল্লাহ্‌র ক্রোধ উদ্রেককারী কঠিন গুনাহ্। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ - (الصف -٣)

তোমরা কেন তা বল যা তোমরা কর না, আল্লাহ্‌র নিকট তার চাইতে ক্রোধ উদ্রেগকারী আর কিছুই নাই।

আল্লাহ্‌র রিসালাত

আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার এবং তাঁর আনুগত্য করা ও বিধান পালন করা আল্লাহ্‌র 'হক্' আদায়ের বাস্তবপন্থার প্রথম অংশ। তার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্য করা। রাসূলের আনুগত্য করার জন্য সর্বপ্রথম

প্রয়োজন 'রিসালাত'—আল্লাহ্‌র রাসূল পাঠানোর প্রতি ঈমান গ্রহণ। কেননা যে লোক রিসালাতের প্রতিই ঈমানদার নয়, তার পক্ষে কোন রাসূলকে মেনে চলা সম্ভব নয়। অথচ রাসূলকে মেনে চলতে, তাঁর আনুগত্য করতে স্বয়ং আল্লাহ্-ই আদেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ج فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

(العمران - ٣٢)

তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র ও রাসূলের। আর যদি তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে জানবে যে, আল্লাহ্ কাফিরদের ভালবাসেন না।

আয়াতটিতে একই 'আনুগত্য কর' আদেশের অধীন প্রথমে আল্লাহ্ এবং তারপরে ও সঙ্গে সঙ্গেই রাসূলের উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করার গুরুত্ব সমান ও অভিন্ন। তবে আল্লাহ্‌র উল্লেখ প্রথমে ও রাসূলের উল্লেখ পরে হওয়ায় মানুষকে সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রে আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ্‌র এবং তার পরেই রাসূলের। এ দু'য়ের মধ্যে কেবল একজনের আনুগত্য করলেই—বিশেষ করে কেবল আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলেই আনুগত্য করার এ আদেশ যথাযথভাবে পালিত হতে পারে না। আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সাথে সাথে রাসূলেরও আনুগত্য করতে হবে। আর তা করা না হলে—তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে 'কুফর' হবে ও লোকদের হতে হবে কাফির। আর 'কুফর' ও 'কাফির'দের আল্লাহ্ ভালবাসেন না। তাহলে আল্লাহ্‌র ভালবাসা—তথা সন্তুষ্টি লাভের উপায় হচ্ছে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করা। এই 'মুখ ফিরিয়ে নেয়া' কথাটির সঙ্গে আল্লাহ্ ও রাসূলের সহিত—সমানভাবে সম্পৃক্ত। তার অর্থ, আল্লাহ্‌র আনুগত্য না করে কেবল রাসূলের আনুগত্য করলে কিংবা রাসূলের আনুগত্য না করে কেবল আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলে; 'মুখ ফিরিয়ে নেয়ার' অপরাধটি হবে। সে অপরাধ হচ্ছে 'কুফর'। আর 'কুফর' ও 'কাফির'কে আল্লাহ্ ভালবাসেন না। আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন মানুষের চরম লক্ষ্য। এ আয়াত অনুযায়ী তা পাওয়ার উপায় হচ্ছে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করা। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ - (النساء - ٦٤)

আমরা যে রাসূল-ই পাঠিয়েছি, তা পাঠিয়েছি এই লক্ষ্যে যে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই তার আনুগত্য করা হবে।

তাহলে রাসূলের আনুগত্য করতে আল্লাহ্‌র পূর্ণ অনুমতি রয়েছে। সত্যি কথা হচ্ছে, রাসূলের আনুগত্য আল্লাহ্‌র অনুমতির উপরই ভিত্তিশীল, সে আনুগত্য

আল্লাহ্‌র মৌলিক আনুগত্যের অধীন, সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। সেই কারণে আল্লাহ্ এও বলে দিয়েছেনঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ(النساء - ٨٠)

যে লোক রাসূলের আনুগত্য করল, সে কার্যত আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল।

কেননা রাসূল আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র সম্পর্কহীন কিছু নন। মৌলিকভাবে বান্দার নিকট আনুগত্য পাওয়ার অধিকার আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার বাস্তব উপায় হিসেবে আল্লাহ্ নিজেই চালু করেছেন রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতা। তাই মানুষ রাসূলের আনুগত্য করবে, এটাও আল্লাহ্‌রই অধিকার, আল্লাহ্‌রই 'হক্'। অতএব আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার লক্ষ্যে রাসূলের আনুগত্য করা মানুষের কর্তব্য। আর তা-ই হচ্ছে আল্লাহ্‌র 'হক্' আদায়ের যথার্থ পন্থা। তাই আল্লাহ্‌র রাসূলই মানুষের নেতা। মানুষ কেবল রাসূলের নেতৃত্বেই জীবন যাপন করবে। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারোরই নেতৃত্ব মেনে নেবে না।

ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌র

মানুষের উপর আল্লাহ্‌র 'হক্' সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অন্য কথায় আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্য সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্য আল্লাহ্‌কে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, ও জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত ও নীতি-আদর্শগত অসীম নিয়ামতের দাতা রূপে ঐকান্তিকভাবে মেনে নেয়া যেমন কর্তব্য, তেমনি কর্তব্য আল্লাহ্‌কে মানুষের একমাত্র মা'বুদ রূপে এবং নিজেকে একমাত্র আল্লাহ্‌র 'আব্‌দ' বা দাস রূপে মেনে নিয়ে কেবলমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত' করা। মানুষের একমাত্র মা'বুদ রূপে স্বীকৃত ও মানিত হওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। মানুষের উপর এই অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই নেই, থাকতে পারে না।, আল্লাহ্‌কেই একমাত্র মা'বুদ রূপে মেনে নেয়া এবং কেবল তাঁরই সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা মানুষের একটি অতি বড় এবং মৌলিক দায়িত্ব। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ - (بنى اسرائل - ٢٣)

তোমার রব্ব্ চূড়ান্তভাবে ফয়সালা ঘোষণা করেছেন যে, হে মানুষ! তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারোরই দাস হবে না—দাসত্ব করবে না। কেননা আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন রাব্বুল আলামীন। মানুষেরও একমাত্র রব্ব্ তিনিই।

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۖ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ - (يوسف - ٤٠)

চূড়ান্তভাবে হুকুমদানের—সার্বভৌমত্বের অধিকার কারোরই নেই, আছে একমাত্র আল্লাহ্‌র। তিনিই এই ফরমান ঘোষণা করেছেন যে, হে মানুষ—তোমরা কারোরই দাসত্ব স্বীকার করবে না একমাত্র তাঁকে ছাড়া।

اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ (هود - ٢٦)

তোমরা হে মানুষেরা—দাসত্ব করবে না কারোরই, একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া।

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ - وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ - (يس - ٦٠-٦١)

হে আদম বংশধর! আমি কি তোমাদের নিকট থেকে এই চুক্তি গ্রহণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব কখনই করবে না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য ও নিঃসন্দেহে শত্রু এবং তোমরা দাসত্ব করবে কেবলমাত্র আমার। বস্তুত আমার দাসত্ব করে জীবন যাপন করাই সুদৃঢ় সরল পথ।

এ আয়াতটি থেকে জানা গেল যে, মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র একটি চুক্তি রয়েছে। সে চুক্তি দুইটি দিক সম্পন্নঃ নেতিবাচক এবং ইতিবাচক। চুক্তির নেতিবাচক দিক হলো, মানুষ কোন ক্ষেত্রেই শয়তানের দাসত্ব করবে না। এই দাসত্ব অর্থ শুধু অ-খোদার পূজা-উপাসনা-আরাধনাই নয় বরং আনুগত্য গ্রহণ ও আদেশ-নিষেধ তথা আইন পালনের ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগী যেমন শয়তানের করা যাবে না, তেমনি শয়তানের অর্থাৎ অ-খোদা শক্তির আনুগত্য স্বীকার করা ও তার দেয়া আইন বিধান রীতি-নীতি কোন কিছুই পালন করাও যাবে না। তা পালন করা আল্লাহ্‌র গৃহীত চুক্তির পরিপন্থী কাজ। আর দ্বিতীয় ইতিবাচক দিক হচ্ছে, দাসত্ব—ইবাদত বন্দেগী থেকে শুরু করে আনুগত্য স্বীকার ও আইন-বিধান ও রীতি-নীতি পালন করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারোরই তা করা যাবে না। করলে আল্লাহ্‌র গৃহীত চুক্তির বরখেলাপ কাজ হবে। বস্তুত এটাই বান্দাগণের উপর আল্লাহ্‌র 'হক', আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দাগণের কর্তব্য। কেননা আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে বসবাসকারী—আল্লাহ্‌রই রিযিক খেয়ে বেঁচে থাকা মানুষ কেবল আল্লাহরই বন্দেগী করবে, কেবল তাঁরই অনুগত ও আইন পালনকারী হবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

ভয় করবে কেবল আল্লাহকে

ভয়—কুরআনের ভাষায় خشية মানুষের একটি স্বভাবগত বিশেষত্ব। মানুষের মধ্যে ভয় পাওয়া বা কোন কিছুকে ভয় করার ভাবধারা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই خشية -এর মধ্যে রয়েছে কাউকে বা কোন কিছুকে 'বড়' মনে করে তাকে ভয় পাওয়ার ভাব। মানুষের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হওয়া এবং সেই ভীতির কারণ এড়িয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা স্থায়ীভাবে বিদ্যমান। আল্লাহ্ বান্দাগণের উপর এই 'হক' বা অধিকার রাখেন যে, মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহ্কেই বড় মনে করবে এবং এই কারণে ভয় করবে কেবল তাঁকেই। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুকে বা কাউকে বড় মনে করা এবং সে কারণে তাকে ভয় করা আল্লাহ্র 'হক' বিনষ্টকারী অপরাধ। সেইজন্যই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِىْ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ –
(البقرة – ١٥٠)

অতএব তোমরা লোকদেরকে ভয় করবে না, ভয় করবে কেবল আমাকে—এ জন্যও, যেন আমি তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত দান সম্পূর্ণ করতে পারি এবং এই আশা-ও করা যায় যে, তোমরা হিদায়ত প্রাপ্ত হবে।

বস্তুত কোন মানুষকে—বাহ্যিকভাবে সে যত বড় ও শক্তিশালীই হোক না কেন তাকে ভয় করা যেতে পারে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে তারা কেউই বড় নয়। বড় কেবল মাত্র আল্লাহ্। অতএব ভয় কেবলমাত্র তাঁকেই করতে হবে। মানুষের এই ভয়টা পাওয়ার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই। কেননা মানুষকে বস্তুগত নিয়ামত (কল্যাণময় জীবনোপকরণ) এবং আদর্শগতভাবে হিদায়ত দানের কাজটি কেবল আল্লাহ্-ই সম্পন্ন করেন। এমতাবস্থায় কেবল আল্লাহ্কেই বড় মনে করা, কেবল তাঁর নিকট থেকেই জীবন বিধান গ্রহণ করা মানুষের কর্তব্য। সে কর্তব্য এই ভয় সহকারে পালন করতে হবে যে, তা না করা হলে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ মানুষকে কঠিন আযাব দিবেন।

তাই নবী-রাসূলগণ কেবল আল্লাহ্কেই ভয় পেতেন, আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেই একবিন্দু ভয় পেতেন না, পরোয়া করতেন না। ইরশাদ হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ –
(احزاب – ٣٩)

যারা আল্লাহ্র রিসালত যথাযথ ও পূর্ণমাত্রায় পৌঁছায়, তারা কেবল তাঁকেই ভয় করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেই একবিন্দু ভয় করে না,—(তাদের

জন্য আল্লাহ্‌র স্থায়ী রীতি হচ্ছে, তাদের দায়িত্ব পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা হবে না)।

اَتَخْشَوْ نَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (التوبه-١٣)

তোমরা চুক্তি ভঙ্গকারী লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ না কেন, তোমরা কি তাদেরকে ভয় পাও?.....অথচ আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সবচেয়ে বেশী হক্‌দার যে, তোমরা কেবল তাঁকেই ভয় পাবে—অবশ্য যদি তোমরা ঈমানদার হও।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার হওয়ার অনিবার্য দাবি হচ্ছে, তোমরা ভয় করবে একমাত্র আল্লাহ্‌কে। কেননা বান্দাগণের প্রতি সকলের তুলনায় অধিক বেশী অধিকার আল্লাহ্‌র এই যে, তারা কেবল তাঁকেই ভয় করবে। তওহীদী ঈমানের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, ভয় করার ব্যাপারেও এই তওহীদকে নিরংকুশভাবে রক্ষা করা। ভয় কেবল আল্লাহ্‌কেই করা এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া কাউকেই ভয় না করা।

বস্তুত মানব প্রকৃতিতে নিহিত এই ভয়ই প্রকৃতপক্ষে মানুষের চালিকা শক্তি। মানুষ যাকে ভয় করে, তাকেই সন্তুষ্ট করে, তাঁর ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তৎপর হওয়া এই ভয়েরই অনিবার্য পরিণতি। মূলত এই ভয় যেমন এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আসল কারণ, তেমনি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যান্য শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ, অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার এবং ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হওয়ার মূলেও এই ভয়ই প্রধান ভাবধারা। তাই কুরআন আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে—কোন কিছুকে একবিন্দু ভয় করার ভাবধারাকে বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত নয়, বরং সকল প্রকার ভয়-ভীতির চূড়ান্ত অবসান সাধন করে একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয় মানুষের মনে-মগজে-জীবনে-চরিত্রে দৃঢ়মূল করা এবং মানুষকে ঈমানের তাকীদে কেবল আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার কাজে উদ্বুদ্ধ করাই কুরআনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ وَرَسُوْ لُهٗ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَا نُوْا مُؤْمِنِيْنَ - (التوبه-٦٢)

আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলই সবচাইতে বেশী অধিকারী এজন্য যে, মানুষ তাঁকেই সন্তুষ্ট করবে—যদি তারা সত্যই মুমিন হয়ে থাকে।

অর্থাৎ তওহীদী ঈমানের অধিকারী লোকেরা কেবল আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্য কর্মতৎপর হবে। অন্য কারোর এক বিন্দু পরোয়া করবে না। কেননা আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হলেই (তাঁর রাসূলও সন্তুষ্ট এবং তার বিপরীত)

বান্দার সার্বিক নিরাপত্তা লাভ সম্ভব। মন যখনই কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য সক্রিয় হবে, তখন তা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে বেষ্টিত হবে। আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করতে প্রস্তুত হবে না। অতএব বান্দা সেই কাজ-ই করবে, যাতে আল্লাহ্‌ (এবং তাঁর রাসূল) সন্তুষ্ট হবেন। যে কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন, সে কাজ করতে মু'মিন বান্দা কখনই প্রস্তুত হতে পারে না। তবে অন্য কেউ—সে যত বড় শক্তিই হোক—অসন্তুষ্ট হলে তার বিন্দুমাত্র পরোয়া করবে না। মুনাফিকরা মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাদের মিথ্যা ঈমান প্রকাশ করত, মুনাফিককে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করত। অথচ আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করাই ছিল অধিক প্রয়োজনীয় কাজ। ইরশাদ হয়েছেঃ

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ - (التوبه -٦٢)

আল্লাহ্‌-ই মানুষকে সুষ্ঠ জীবন বিধান দেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউই পূর্ণাঙ্গ সুষ্ঠু ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণময় জীবন বিধান দিতে পারে না। অতএব আল্লাহ্‌ই সবচাইতে বেশী অধিকারী যে, তাঁরই দেয়া জীবন বিধান মানুষ মেনে চলবে, তদনুযায়ী জীবন গঠন ও যাপন করবে।

ইরশাদ হয়েছেঃ

قَلِ اللّٰهُ يَهْدِىْ لِلْحَقِّ ط اَفَمَنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْ اِلَّا اَنْ يُّهْدٰى - فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ - (يونس -٣٥)

বল আল্লাহ্‌-ই সত্যের পথ দেখান। তাই যে সত্তা সত্যের পথ দেখান তাঁর কি সবচাইতে বেশী অধিকার নয় যে, তাঁকেই মেনে চলা হবে?... না, সে বেশী অধিকারী, যে নিজে হিদায়ত দেয় না, বরং তাকেই হিদায়ত দিতে হয়?

বস্তুত মানুষের প্রতি সর্বাধিক বলিষ্ঠ 'হক' কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র। আর কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের সর্বাধিক কর্তব্য হচ্ছে কেবল তাঁরই জীবন বিধান মেনে চলা।

আল্লাহ্‌র উপর মানুষের হক

মানুষ। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তাই মানুষের উপর যেমন আল্লাহ্‌র 'হক' রয়েছে, তেমনি মানুষেরও 'হক' রয়েছে আল্লাহ্‌র উপর।

আল্লাহ্র উপর মানুষের এই 'হক্' স্বয়ং আল্লাহ্ই ধার্য করে নিয়েছেন, মানুষ বা অন্য কোন শক্তি তা ধার্য করেনি। এটাও মহান আল্লাহ্ একটি অতিবড় মেহেরবানী। আল্লাহ্ নিজেই যদি তা নিজের উপর ধার্য করে না নিতেন মেহেরবানী করে, তাহলে তা আল্লাহর উপর আরোপ বা ধার্য করার কোন সাধ্যই ছিল না মানুষ বা অন্য কোন শক্তির। আল্লাহ্ নিজেই পরম অনুগ্রহবশত মানুষকে সেরা সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করিয়াছেন, আল্লাহ্ই ইরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا -

(الا سرا ئيل - ٧٠)

এবং নিশ্চিতভাবেই মহা সম্মানিত করেছি আদম বংশধরদের এবং তাদের বহন করে নিয়ে গেছি স্থল ও জলভাগে, তাদের পবিত্র উৎকৃষ্ট দ্রব্যসমূহ থেকে রিযিক দিয়েছি। আর আমাদের বিপুল সৃষ্টির মধ্যে অনেকেরই উপর তাদের অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বানিয়েছি।

ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ এ আয়াতে আল্লাহ্র ঘোষণা হচ্ছে মানুষের জন্য অতীব মান-সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার। এই মর্যাদার মধ্যে শামিল রয়েছে মানুষকে বিশেষ আকার-আকৃতি ও সুরত-শিকলে সৃষ্টি করা, সোজা এক হাড়া দেহ নিয়ে দাঁড়ানো, সুন্দর চেহারা ইত্যাদি মানুষকে স্থল ও জল—উভয় ভাগে চলাচল করার যোগ্যতা দান। এই কাজ মানুষের পক্ষেই সম্ভব করে দেয়া হয়েছে, মানুষ নিজ ইচ্ছানুক্রমেই এই চলাচল কার্য করতে পারে, পারে সে জন্য উত্তম ও প্রয়োজন অনুপাতে পরিবর্তিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। মানুষের জন্য উত্তম-উৎকৃষ্ট খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তা মানুষের জন্য যতটা ব্যাপক ও প্রশস্ত, ততটা অন্য কোন জীব বা প্রাণীর জন্য নয়। মানুষ উপার্জন করে, নিজ প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে নির্মাণ করে, অন্যরা তা করে না, করতে পারে না। মানুষ যৌগিক খাদ্য গ্রহণ করে, অন্যান্য জীব ও প্রাণী অবিমিশ্র খাদ্য খায়। জন্তু জানোয়ার কাঁচা অপরিপক্ক গোশত খায়, মানুষ খায় রান্না করা খাদ্য। ইমাম তারাবীর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মানুষ নিজ হাতে ধরে খাবার খায়, অন্যন্য জন্তু জীব-প্রাণী খায় সরাসরি মুখ দিয়ে। অন্যান্য মনীষীদের মতে, মানুষকে বাকশক্তি ও দশটি জিনিসের মধ্য থেকে নিজ পছন্দ অনুযায়ী একটিকে বাছাই করার এবং ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি দেয়া হয়েছে। মানুষ ছাড়া জীবলোকে অন্য কারোর তা নেই।

মানুষকে দুনিয়ার সব জন্তু-জানোয়ারের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কথা বলার ও লেখার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। বুঝ-সমঝ দেয়া হয়েছে। মানুষের রয়েছে বিবেক ও চিন্তা-গবেষণা শক্তি। মানুষ আল্লাহ্কে চিনতে পারে। তাঁর কালাম পড়তে ও অনুধাবন করতে পারে। তাঁর নিয়ামতসমূহের মূল্যায়ন ও প্রেরিত নবী-রাসূলকে চিনতে, বিশ্বাস করতে ও মেনে চলতে পারে।

(আল-জামে লি আহাকামিল কুরআন, ১০ম খন্ড, ২৯৩-১৯৪ পৃ.)

অনুরূপ আর দুটি-ঘোষণা হচ্ছেঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ - (التين)

নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি।

এ ঘোষণা যেমন মানুষের বাহ্যিক ও দৈহিক আকার-আকৃতির উত্তমতার প্রসঙ্গে, তেমনি মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ-গরিমা, মানসিক বৈশিষ্ট-বিশেষত্ব পর্যায়েও।

মানুষ যেহেতু জীব ও প্রাণী পর্যায়ের সৃষ্টি। আর জীব ও প্রাণী মাত্রকেই ক্ষুধা ও খাদ্য গ্রহণের গুণে ভূষিত করেছেন। তাই আল্লাহ্ সকলের রিযিক-এর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিজেই নিজের উপর তুলে নিয়েছেন। ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا - (هود - ٦)

পৃথিবীতে যত বিচরণ ক্ষমতাসম্পন্ন জীব-জন্তু রয়েছে, সকলেরই প্রয়োজনীয় রিযিক দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ্র।

বস্তুত মানুষ মর্যাদা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টি হলেও তার জন্য প্রয়োজনীয় রিযিক-এর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ না করলে তার পক্ষে দুনিয়ায় বেঁচে থাকাই সম্ভবপর হতো না। মানুষের এই রিযিক-এর ব্যবস্থা করেছেন মানুষকে কর্ম ক্ষমতা, বিবেক-বুদ্ধি, উদ্ভাবন ও উৎপাদন শক্তি দিয়ে একদিকে, আর অপরদিকে যমীনে ও প্রকৃতিতে উৎপাদন ও উর্বরাশক্তি পুঞ্জিভূত করে দিয়ে। মানুষ যদি যমীন চাষ করত, বীজ ফেলত, কিন্তু যমীনের ফসল ফলাবার শক্তি না থাকত, তাহলে মানুষকে খাদ্যহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে হতো। মানুষ চকমকি বা দিয়াশলাইর কাঠিতে খোঁচা দিত, কিন্তু তাতে যদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে না উঠত, তাহলে মানুষের সাধ্য ছিল না কোন কিছু রান্না করার, রান্না করা খাদ্য গ্রহণের বা আগুন জ্বালিয়ে কোন জিনিস উত্তপ্ত করার।

মানুষের মধ্যে কর্ম-ক্ষমতা একদিকে, যমীন ও প্রকৃতিতে খাদ্য দ্রব্য সামগ্রীর সমাহার অন্যদিকে। এই দুইটি বিচ্ছিন্ন দিকের মধ্যে সংযোগ সাধনকর্ম ঘটানো মানুষের আয়ত্তাধীন হওয়াও দুটির মত এটাও আল্লাহ্‌র একটি মহা দান। তিনি নিজে মানুষের এই অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন বলেই তা কার্যত সম্ভব হচ্ছে।

দুনিয়ার নির্ভুল জীবন পথের সন্ধান লাভও আল্লাহ্‌র উপর মানুষের একটি 'হক', একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকারও আল্লাহ্‌ নিজেই দয়া স্বরূপ স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই আল্লাহ্‌ নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তাঁর কিতাব। তাই আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেনঃ

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَـلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا – (النساء -١٦٥)

এসব রাসূলই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরিত, যেন তাঁদের প্রেরণের পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে লোকদের পেশ করার মত কোন দলীল (বা যুক্তি) অবশিষ্ট থেকে না যায়। আর আল্লাহ্‌ তো আসলেই সর্বজয়ী, মহা বিজ্ঞানী।

বস্তুত আল্লাহ্‌ নিজেই সর্বজয়ী মহাবিজ্ঞানী বলে নিজেই বুঝে নিয়েছিলেন যে, এই মানুষ যে গুণশক্তি-ক্ষমতায় সৃষ্ট, তাতে নবী-রাসূল পাঠিয়ে তাদের নির্ভুল জীবন পথের সন্ধান ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দেয়া না হলে তারা কখনই নিজস্ব শক্তি ও প্রতিভা বলে নির্ভুল জীবন পথের সন্ধান পাবে না, জানতে পারবে না আল্লাহ মনোনীত জীবন-বিধান। আর তাহলে তখন তাদের একথা বলার সুযোগ থাকতো যে, হে আল্লাহ্‌ঃ তুমি আমাদেরকে সেরা সৃষ্টি, মর্যাদাবান সৃষ্টি বানিয়েছিলে বটে। কিন্তু নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বহাল রাখার মত জীবন-বিধান ও জীবন-পথের সন্ধান তুমি আমাদেরকে দাওনি। নবী-রাসূল প্রেরণের ফলে এই তত্ত্বকথা বলার সুযোগ তিরোহিত।

নির্ভুল জীবন পথের সন্ধান ও জীবন-বিধান লাভ করার ব্যাপারে মানুষের এই অধিকার আল্লাহ্‌ নিজেই স্বীকার করেছেন এবং এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থিতির সূচনাতেই নবী-রাসূল ও কিতাব বিধান প্রেরণের ব্যবস্থা কার্যকর করেছেন। আদম (আ)-কে দুনিয়ায় প্রেরণকালেই গোটা আদম বংশকে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌ কালামে জানিয়ে দিয়েছিলেনঃ

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ – (البقرة – ٣٨)

তোমাদের নিকট আমার নিকট হতে হিদায়তকারী (ব্যক্তি ও কিতাব) আসবে। যে আমার হিদায়ত মেনে চলবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না, দুশ্চিন্তাও করতে হবে না।

এ পর্যায়ে মনীষী কায়াব আল-আহ্‌বার বলেছেনঃ দুই লক্ষ দুই হাজার নবী এসেছেন। মুকাতিল বলেছেনঃ নবী এসেছেন দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। আনাস ইবন মালিক (রা) রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ

بَعِثْتُ عَلٰى اَثْرِ ثَمَا نِيَةَ اٰلاَف مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْهُمْ اَرْبَعَةُ اٰلاَفٍ مِنْ بَنِى اِسْرَئِيْلَ -

আমি আট হাজার নবীর পরে প্রেরিত হয়েছি। তাঁদের মধ্যে চার হাজারই হচ্ছেন বনি ইসরাইলী বংশের।

আবুল লাইস সমরকন্দী তাঁর তাফসীরে এই হাদীসটি ভিন্নসূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। হযরত আবূ যার গিফারী (রা) বলেছেনঃ আমি বললামঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ كَانَتِ الْاَنْبِيَاءُ وَكَمْ كَانَ الْمُرْسَلُوْنَ -

হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মোট নবী কতজন ছিলেন? আর তাঁদের মধ্যে রাসূল কতজন?

জবাবে তিনি বললেনঃ

كَانَتِ الْاَ نْبِيَاءُ مِائَةٌ اَلْف نَبِيٍّ وَاَرْبَعَةَ عِشْرِيْنَ اَلْفِ نَبِيٍّ وَكَانَ الْمُرْسَلِيْنَ ثَلَثَا مِائَةٌ وَثَلَثَةَ عَشَرَ -

নবী ছিলেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। আর রাসূল ছিলেন তিন শত তের জন।

ইমাম কুরতুবীর মতে এটাই এ পর্যায়ে সহীহ্‌তম বর্ণনা। তফসীরে কুরতুবী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯ পৃ।

এটা এ কারণেও যে, আল্লাহ্ মানুষের এই হক্ নিজেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, তিনি নবী-রাসূল না পাঠিয়ে কখনও তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করবেন না।

নবী ও রাসূল প্রেরণের মূলে যে দর্শন নিহিত রয়েছে, তা আল্লাহ্ নিজেই বলে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا – (اسرئيل -١٥)

আমরা কখনই আযাবদানকারী হই না, যতক্ষণ না কোন রাসূল পাঠাই।

অর্থাৎ পূর্বাহ্নে নবী-রাসূল পাঠিয়ে মানুষকে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পূণ্য সম্পর্কে—আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম ও সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির কথা জানিয়ে না দিয়ে মানুষকে আযাব দেয়া আল্লাহ্‌র নিয়ম নয়। কেননা তা করা না হলে মানুষের পক্ষে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। এরূপ অবস্থায় কোন কাজের জন্য মানুষকে আযাব্‌ দেয়া যুক্তিসঙ্গতও হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা পূর্বাহ্নেই নবী-রাসূল পাঠিয়ে বাস্তবভাবে জরুরী জ্ঞান দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই গোটা ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই ভাষায়ঃ

وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى – (طه - ١٣٤)

আমরা যদি রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল করার পূর্বেই কোন আযাব দিয়ে তাদের ধ্বংস করে দিতাম, তাহলে এই লোকেরাই বলতে পারতো যে, হে আমাদের রব্ব্‌! তুমি আমাদের নিকট কোন রাসূল পাঠালে না কেন? তাহলে (দুনিয়ায়) লাঞ্ছিত, অপমানিত ও (জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে) লজ্জিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তোমার আয়াত সমূহ মেনে চলা শুরু করে দিতাম।

রাসূল পাঠানো ও কিতাব নাযিল করার পর মানুষের নিজের কৃতকর্মের ফল হিসেবে আযাব দেয়া হলে মানুষের কিছুই বলবার থাকতে পারে না। কেননা এই আযাবের জন্য সে নিজেই দায়ী, অন্য কেউ নয়। বস্তুত রাসূল পাঠিয়ে ও কিতাব নাযিল না করে মানুষকে কোন কাজের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত না করা এবং সে জন্য তাকে কোন শাস্তি না দেয়া আল্লাহ্‌র উপর মানুষের 'হক্‌'। আল্লাহ্‌ মানুষের এই 'হক্‌' পুরামাত্রায় আদায় করে দিয়েছেন। এক্ষণে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল (স)-কে এবং তাঁর কিতাব কুরআন পুরাপুরি মেনে চলা।

যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যথার্থ ঈমান এনে আল্লাহ্‌র কিতাব ও বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, আল্লাহ্‌র উপর তাদের 'হক্‌' হচ্ছে, (আল্লাহ্‌

নিজেই দয়া করে এই হক্ স্বীকার করে নিয়েছেন) যে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাত দান করবেন। তাই তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেনঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا

(النساء - ١٢٢)

আর যারাই ঈমান গ্রহণ করবে ও ঈমানের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন নেক আমল করবে, তাদেরকে আমরা অবশ্যই এমন জান্নাতে দাখিল করব, যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারাসমূহ সদা প্রবহমান। তারা চিরদিন স্থায়ী হয়ে সেখানে অবস্থান করবে। এটা আল্লাহ্‌র সত্য ওয়াদা। আর আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক সত্য ওয়াদা আর কে করতে পারে?

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য-অগ্রাহ্য করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চাইবে (এভাবে যে, আল্লাহ্‌কে মানবে রাসূলকে মানবে না, কিংবা এর বিপরীত), কতক নবীর প্রতি ঈমান আনবে, অন্য কতককে অবিশ্বাস করবে, তারা প্রকৃত কাফির।

وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا - (النساء -١٥١)

এবং কাফিরদের জন্য অপমানকর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

বস্তুত ঈমানদার ও নেক আমলকারী লোকদেরকে জান্নাত দান এবং বেঈমান কাফিরদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করা আল্লাহ্‌র শাশ্বত নীতি এবং তা-ই মানুষের 'হক্' আল্লাহ্‌র উপর। আল্লাহ্ এর বিপরীতটা না করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটাই আল্লাহ্‌র ন্যায়পরতা ও সুবিচার। আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এই সুবিচার পাওয়া মানুষের একটি প্রতিষ্ঠিত হক্। সূরা আল-আ'রাফ-এ বলা হয়েছে; জান্নাতবাসীরা জাহান্নামীদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করবেঃ

اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا-قَالُوْا نَعَمْ ...... (اعراف-٤٤)

আমরা আমাদের রব্ব-এর ওয়াদাসমূহ বাস্তবভাবে সত্যরূপ পেয়েছি, তোমরাও কি তোমাদের রব্ব-কৃত ওয়াদা সত্যরূপে পেয়ে গেছ?..... জবাবে তারা বলবেঃ 'হ্যাঁ'।

বস্তুত আল্লাহ্ মানুষের নিকট অনেক ওয়াদা করেছেন। সে ওয়াদাসমূহকে বাস্তবভাবে পূরণ করা এবং ওয়াদার খেলাফ না করা—আল্লাহ্‌র নিজেরই এক স্থায়ী নীতি। আর আল্লাহ্‌র উপর মানুষের 'হক্' হচ্ছে, তিনি কোন ওয়াদারই খেলাফ করবেন না। এই জন্যই আল্লাহ্ তাঁর স্থায়ী নীতির কথা ঘোষণা করেছেন এই ভাষায়ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَادَ – (ال عمران-٩)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কৃত ওয়াদার খেলাফ করেন না।

নবীর আগমনের পর সমাজে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাতে একদিকে থাকে ঈমানদার লোক, আর অপর দিকে বেঈমান অপরাধী লোক। এ দু'শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্য এবং বিবাদ-বিসম্বাদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই পর্যায়ে আল্লাহ্‌র নীতি কি হবে?... এইরূপ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্‌র উপর ঈমানদার লোকদের 'হক্' এই হয় যে, তিনি ঈমানদার লোকদেরকে সাহায্য করবেন এবং বেঈমানদের পর্যুদস্ত করে দেবেন। আল্লাহ্‌র ঘোষণাও ঠিক তাইঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ –
(الروم -٤٧)

হে নবী! তোমার পূর্বে আমরা নবী-রাসূলগণকে তাদের জনগণের নিকট প্রেরণ করেছি। তাঁরা আমাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনাদি লয়ে এসেছে। তাপপর যারা (তা অমান্য করে) অপরাধ করেছে, আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। আর মু'মিনদের সাহায্য করা তো আমাদের দায়িত্বই।

আল্লাহ্ নিজেই মু'মিনদের সাহায্য করার—ইসলাম ও কুফর এর দ্বন্দ্ব ইসলামের পক্ষের সংগ্রামীদেরকে কাফিরদের মুকাবিলায় বিজয়ী করার—নীতি ও দায়িত্ব নিজের উপর তুলে নিয়েছেন। তুলে নিয়েছেন আল্লাহ্‌র উপর ঈমানদার লোকদের 'হক্' হিসেবে। অতএব ঈমানদার লোকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল—আল্লাহ্‌র এই দায়িত্ব পালন করার—ঈমানদারদের এই 'হক্' আদায় করার সুযোগ ও ক্ষেত্র তৈরী করে দেয়া। আর তা তখনই সম্ভব, যখন ঈমানদার লোকেরা দ্বীন-ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

হুক্কুল ইবাদ—মানুষের হক্

হক্কুল ইবাদ বা মানুষের হক্ পর্যায়ে সর্বপ্রথম আলোচিতব্যঃ ব্যক্তির নিজের হক্ বা নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য। সে 'হক্' আদায় করাও মানুষের নিজের কর্তব্য। কেননা যে লোক নিজের হক্ আদায় করে না, সে অন্য কারোরই হক্ আদায় করতে পারে না। সূরা আল-কাহাফ-এ এক পাষাণ মালিক কাফির ব্যক্তির অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছেঃ

وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ (الكهف - ٣٥)

সে নিজের প্রতিই জুলুমকারী।

তার অর্থ, ব্যক্তি নিজের উপরও জুলুম করে থাকে। ব্যক্তি নিজের উপর জুলুম করে কিভাবে? তার জবাবে ইমাম কুরতুবী বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুফরী করার দরুন নিজেকে জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য বানায়, সে-ই নিজের উপর জুলুম করে। পূর্বে সে এই বলে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছিলঃ

مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖ اَبَدًا- (الكهف - ٣٥)

আমি মনে করি না যে, এই সম্পদ কোন দিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

অন্য কথায় সে এই পৃথিবীর চিরস্থায়ীত্ব এবং পরকাল না হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। তার ফলভারে সমৃদ্ধ বাগান চিরদিন তাকে ফল সম্পদ দিয়ে ধন্য করতে থাকবে বলে বিশ্বাস করেছিল। বস্তুত পরকাল অবিশ্বাস করার নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ ও জীবনধারা গ্রহণ। সেই সাথে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রেরিত বিধান ও পরকালে অবিশ্বাস বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরই অনিবার্য পরিণতি। তার পক্ষে আল্লাহ্র দাসত্ব স্বীকার এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে চলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর যে লোকের পক্ষেই তা অসম্ভব, সে-ই নিজের উপর নিজে জুলুমকারী। তার নিজের উপর 'হক্' ছিল, সে নিজেকে জাহান্নামের মর্মান্তিক পরিণতিতে নিক্ষেপ করবে না। কিন্তু সে 'কুফর' গ্রহণ করে তাই করেছে। ফলে তার উপর তার নিজের যে 'হক্'

ছিল তা সে আদায় করতে পারেনি, নিজের প্রতি তার যে কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল, তা পালন করতে সে অক্ষম রয়ে গেছে।

বস্তুত নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন না করা—নিজের উপর নিজের 'হক্‌' আদায় না করা, আর পরিণামে নিজের উপর নিজেই জুলুম করার ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ ও প্রাচীন। হযরত মূসা (আ) 'তুর' পর্বতে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কিতাব গ্রহণ করতে যাওয়াকালীন অনুপস্থিতির সুযোগে বনী ইসরাইলীরা যে অপরাধ করেছিল, তিনি ফিরে এসে সেই প্রসঙ্গে তাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ

يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِا تِّخَاذِ كُمُ الْعِجْلَ - (البقره - ٥٤)

হে আমার জনগণ! তোমরা তো নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছ বাছুরকে পূজ্যরূপে গ্রহণ করে।

হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাইলীদের তওহীদের প্রতি ঈমান গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার বানাবার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু পূর্বে যেহেতু তারা ছিল গো-পূজারী, হযরত মূসা'র অনুপস্থিতিতে তাদের মধ্যে সেই প্রাচীন বিকার ও শিরকী ভাবধারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং তারা পুঞ্জিভূত স্বর্ণের দ্বারা একটি বাছুর বানিয়ে পূজা করতে শুরু করে। তওহীদী দ্বীনের দৃষ্টিতে এটা ছিল সুস্পষ্ট শির্‌ক। আর শির্‌ক করেই তারা নিজেদেরকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যোগ্য বানিয়েছিল।

পরে আল্লাহ্‌ তা'আলা বনী-ইসরাইলীদের তীহ ময়দান পরিক্রমা ব্যাপদেশে তাদের উপর মেঘের ছায়া এবং মান্‌ ও সালওয়ার শ্রমহীন খাবারের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু এই মালকে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে গ্রহণ না করে এবং তাঁর এই অনুগ্রহের বিনিময়ে শোকর না করে তারা তাঁর প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। ফলে তারা আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এই পর্যায় আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ

وَمَا ظَلَمُوْ نَا وَلٰكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ- (البقره-٥٧)

ওরা আমার উপর জুলুম করেনি, ওরা যা করেছে তাতে ওরা নিজেদের উপরই নিজেরা জুলুম করছিল।

বোঝা গেল, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের দানকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা ও তাঁর শোকর করাই বান্দার কর্তব্য। তা না করা হলে যে পরিণতি দেখা দেয়, তাতে আল্লাহ্‌র তো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য জুলুমকারী হয়,

সে জুলুমের মর্মান্তিক ক্ষতি তারা নিজেরাই ভোগ করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের হক্‌ আদায় করে।

সূরা আল-ইমরান-এর একটি আয়াতে কাফিরদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারবে না (১১৬ আয়াত) বলার পর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলেছেনঃ এই দুনিয়ায় ওদের ধন-মাল ব্যয় করার ব্যাপারটি এমন, যেমন তীব্র শীতল বায়ু কিংবা লু' হাওয়া। তা যদি কোন ফসল সম্ভার বা ফসল ভরা ক্ষেতের উপর প্রবাহিত হয়, তাহলে ক্ষেতটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, ক্ষেতকারী কৃষকের সমস্ত শ্রম ও বিনিয়োগ নিষ্ফল হয়ে যায়। এই পর্যায়ে আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ - (ال عمران- ١١٧)

আল্লাহ্‌ ওদের উপর জুলুম করেন নি, বরং ওরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল।

আল্লাহ্‌র আয়াত ও বিধান যারা অসত্য মনে করে এবং অমান্য করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ "নিজেরাই যারা নিজেদের উপর জুলুম করে, নিজেরাই নিজেদের হক্‌ আদায় করে না, ওরা হচ্ছে তাদের নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত।"

(—আল-আ'রাফ-১৭৭)

যারা নবী-রাসূলগণকে অগ্রাহ্য ও অমান্য করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ

فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ-

(التوبه - ٧٠)

ওদের উপর আল্লাহ্‌ কোন জুলুম করছিলেন না। বরং ওরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল।

সূরা-আল-আন্‌কাবুত-এ আল্লাহ্‌ কারুন, হামান ও ফিরাউনের আচরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ওদের নিকট মূসা (আ) অকাট্য দলীল-প্রমাণসহ উপস্থিত হয়েছেন; কিন্তু ওরা যমীনে 'বড় মানুষ' হয়ে বসেছিল, অহংকার করে তাকে অগ্রাহ্য ও অমান্য করেছিল, তখন এদের প্রত্যেকের গুনাহের জন্য আল্লাহ্‌ প্রত্যেককে পাকড়াও করেছেন। এই পাক্‌ড়াও'র ধরণ বা রূপ এক রকমের হয়নি, বিভিন্নভাবে তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ্‌ পাকড়াও করেছেন। কারোর উপর এসেছে

প্রচণ্ড চিৎকার, সর্ব প্রকম্পন ধ্বনি, বিদ্যুতের গর্জন প্রভৃতি বড় বড় কঠিন আযাব। কারোর উপর এসেছে ভূমি ধ্বংস এবং কাউকে আল্লাহ্‌ ডুবিয়ে মেরেছেন এ সবের দরুনঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ –
(العنكبوت – ٤٠)

আল্লাহ্‌ ওদের উপর জুলুম করেন নি; বরং ওরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল।

এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত ঘোষণা হচ্ছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ –
(يونس – ٤٤)

আল্লাহ্‌ কখনই জনগণের উপর একবিন্দু জুলুম করেন না। বরং সত্যি কথা হচ্ছে, লোকেরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করে।

আল্লাহ্‌র এ ঘোষণার তাৎপর্য হচ্ছে, নবী-রাসূলকে অমান্য-অগ্রাহ্য করা, আল্লাহ্‌র নাফরমানী করা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া লোকদের উপর প্রকৃতির প্রতিশোধ হয়ে দেখা দেয়। আসে বিভিন্ন বিচিত্র ধরনের কঠিন কঠিন প্রলয়ংকর আযাব। এই আযাব আল্লাহ্‌ নিজে আনেন না, এ আযাব তারা নিজেরাই নিজেদের প্রকৃতি পরিপন্থী আমল দ্বারা আহ্‌বান করে আনে।

বস্তুত নিজের উপর নিজের জুলুম যেমন ব্যক্তিগতভাবে হয়, তেমনি হয় সমষ্টিগত এবং তার প্রতিক্রিয়ায় প্রকৃতির প্রতিশোধও হয়—ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও জাতিগতভাবেই। আমরা পৃথিবীর চলমান ঘটনাবলীতে এই উভয় প্রকারের প্রতিশোধ-ই প্রত্যক্ষ করতে পারছি। এই ধরনের নিজের উপর নিজের জুলুম-এর কাজ অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার। প্রত্যেকটি বান্দার ব্যক্তিগতভাবে এবং বান্দা সমষ্টির সামষ্টিকভাবে এই আত্মধ্বংসমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় নিজের নিকটই কৈফিয়ত দিতে পারবে না, ব্যক্তি বা সমষ্টি কেন বিপর্যস্ত হলো বা ধ্বংস হলো, তার জবাব অন্য কোথাও খুজে লাভ নেই।

ব্যক্তির উপর নিজ সত্তার 'হক্‌' হচ্ছে এই জুলুম থেকে বিরত থাকা এবং নিজেকে তা থেকে বিরত রাখা। এটাই তার কর্তব্য নিজের প্রতি। প্রত্যেকটি জাতির ব্যাপারেও এই কথা। কেননা নিজেরই কৃতকর্মের ফলে মারাত্মক

পরিণতিতে পড়ে গেলে, সেজন্য কারোর উপর দোষ দেয়ার কোন সুযোগই থাকবে না।

ব্যক্তির নিজের উপর নিজের 'হক্' থাকার কথা—অন্য কথায়, নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য থাকা সম্পর্কে খোদ রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

فَانَّ لِنَفْسِكَا عَلَيْكَا حَقًّا .... فَانَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا - (بخارى- كتاب الصوم)

জানবে, তোমার নিজের জন্য তোমার উপর একটা 'হক্' রয়েছে..... তোমার দেহের জন্য তোমার উপর একটা হক্ রয়েছে। তোমার দুইটি চক্ষুর জন্য-ও তোমার উপর একটা হক্ রয়েছে।

পূর্বেই বলেছি, এই হক্ অর্থ কর্তব্য। ব্যক্তির নিজের প্রতি, নিজ দেহের প্রতি এবং নিজ চক্ষুদ্বয়ের প্রতি কর্তব্য। অর্থাৎ তুমি এমন কোন কাজ করতে পার না, যার ফলে তোমাকে ইহকালে কি পরকালে বিপদে পড়তে হয়। তোমার দেহ বা চক্ষুকে এমন কাজে ব্যবহার করতে পার না, যার পরিণতিতে তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে, তুমি শারীরিকভাবে কষ্টের মধ্যে পড়ে যেতে পার, অস্বাভাবিক ধরনের শ্রমের মধ্যে আটকে যেতে পার। চক্ষুদ্বয়কে এমন কিছু দেখার কাজে ব্যবহার করতে পার না, যার ফলে তোমার চক্ষু দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারে, তোমার চক্ষু কলুষতার মধ্যে পড়ে পংকিল হয়ে যেতে পারে। এভাবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে-ও সকল হারাম কাজ থেকে পবিত্র রাখা বান্দার নিজের কর্তব্য; নিজের উপর নিজের হক্ হচ্ছে তা।

নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন—অন্য কথায় নিজের উপর নিজের হক্ আদায় করতে হলে সর্বপ্রথম নিজেকে সর্বপ্রকার জুলুম থেকে বিরত রাখতে হবে। নিজের উপর নিজের জুলুমের কতিপয় মৌলিক দিক কুরআনের ভিত্তিতে ইতিপূর্বে স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করা হয়েছে। এই পর্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা এখানে পেশ করা যাচ্ছে।

এই পৃথিবী একটি বস্তুগত সত্তা। আর বস্তুর মধ্যে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক (Negative & positive) উভয় দিকই রয়েছে। মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী, জীবন ধারণ, বসবাস, বিচরণকারী একটি বিশেষ সৃষ্টি। তাই তার কর্তব্যের ক্ষেত্রে, নিজের উপর নিজের 'হক্' আদায় করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় ধরনের পথ ও পন্থা থাকা খুবই স্বাভাবিক।

অতএব, ব্যক্তির নিজের উপর নিজের হক্ পর্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা পেশ প্রসঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম সেই দিকগুলিকে সম্মুখে নিয়ে আসব, যা মানুষের জন্য শুভ নয়, যা মানুষের নিজের উপর নিজের হক্ আদায়ের পরিপন্থী। তা থেকে মানুষকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে, নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

হীন, নিকৃষ্ট-বীভৎস গুণ ও কার্যাবলী

হীন, নিকৃষ্ট-বীভৎস 'গুণ' ও কার্যাবলী বলতে আমরা সেসব জিনিসই বোঝাতে চাই, যা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়, যা থেকে বিরত থাকার জন্য বা মানা করার জন্য আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন; কিংবা যা যা করতে নিষেধ করেছেন। যে কাজ করলে কোন ব্যক্তি বা সমষ্টিকে গুনাহ্‌গার হতে হয়। যথা—যেগুলির হীন-নিকৃষ্ট বীভৎস হওয়ার কথা সকল সমঝদার-সুস্থ, বুদ্ধিমান মাত্রই অকপটে স্বীকার করে; যেসব কাজের ফলে ব্যক্তি ও সমষ্টির মানুষকে বস্তুগত ও নৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, যে সবের দরুন পরিবার, সমাজ ও জাতি ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং তাদের বৈষয়িক ও দ্বীনী উন্নতি-অগ্রগতি ব্যাহত হয়, সৌভাগ্য ও কল্যাণের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

কুরআন মজীদে এ পর্যায়ের গুণ বা কাজগুলিকে কোথাও 'মুনকার' (অপরিচিত বা ঘৃণিত) কোথাও 'ফাহ্‌শা' (নির্লজ্জতা-অশ্লীলতা), কোথাও 'সাইয়্যেয়া' (নিকৃষ্ট, মন্দ), কোথাও 'মাকরূহ' (ঘৃণ্য বা অপছন্দনীয়), কোথাও 'খাতা' (ভুল), কোথাও 'ইসম' (পাপ, গুনাহ), আর কোথাও উদ্‌ওয়ান (সীমালঙ্ঘন) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সব শব্দের ব্যবহারে মূল জিনিস বা কাজটির ঘৃণ্য ও কুৎসিত রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ সব কাজ সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি এবং আল্লাহ্‌র বিধান—উভয়ের দৃষ্টিতে অবশ্যই পরিহার্য। এসব কাজ থেকে ব্যক্তির ও জনগোষ্ঠীর বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। নিজের উপর এটাই নিজের হক, নিজের প্রতি এটাই তার নিজের কর্তব্য।

ইরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا - وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا .... وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا - كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا -

(بنى اسرئيل - ٣١-٣٢- ٣٧-٣٨)

তোমরা দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা (হওয়া বন্ধ) করো না। কেননা আমরাই তাদের রিযিক দিব, যেমন তোমাদেরও দিচ্ছি। নিঃসন্দেহে তাদের হত্যা করা অত্যন্ত বড় ভুল। আর তোমরা যিনার নিকটেও যাবে না। বস্তুত এ একটি অতীব নির্লজ্জতা ও অত্যন্ত খারাপ পথ..... তোমরা যমীনে অহংকার দৃপ্ত পদক্ষেপে চলাফেরা করো না। কেননা তোমরা কক্ষণই যমীনকে দীর্ণ করতে পারবে না, দৈর্ঘ্যে পর্বতের উচ্চতায় কক্ষণই পৌছতে পারবে না। এ সবের মধ্যে প্রত্যেকটি খারাপ কাজই তোমার "রব্ব"-এর নিকট ঘৃণিত।

সর্ব প্রকারের নীচত-হীনতা-অশ্লীলতাকে কুরআন 'মুনকার'-এর ন্যায় একটি সাধারণ অর্থবোধক শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। বনী ইসরাইলীরা যেসব জঘন্য-ঘৃণ্য কার্যকলাপে নিমগ্ন ছিল এবং যেগুলি থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে চেষ্টা না করার জন্য সে সমাজের আলেম-পীর-নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তীব্র ভাষায় যে ভর্ৎসনা করা হয়েছে, সেই সবকে এই 'মুনকার' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে সূরা আল-মায়িদা'র এ আয়াতেঃ

كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۖ لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ-

(المائدة ৭৯)

তারা যে সব মুনকার—ঘৃণ্য-অশ্লীল মন্দ কাজ করছিল, তা থেকে তারা পরস্পরকে বিরত রাখার কাজ করতো না। মূলত তারা অত্যন্ত খারাপ কাজই করছিল।

আবূ দাউদ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেনঃ বনি ইসরাইলী সমাজে সর্ব প্রথম যে লোক ত্রুটির সৃষ্টি করেছে সে এভাবে করেছে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে পাপের কাজে লিপ্ত দেখে প্রথমে তাকে বলতঃ হে ব্যক্তি! আল্লাহ্কে ভয় কর, তুমি যা করছ তা বন্ধ কর, পরিহার কর। কেননা এ কাজ তোমার জন্য মোটেই হালাল নয়। কিন্তু পরের দিন যখন সে সেই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করত, তখনও সেই গুনাহের কাজে তাকে লিপ্ত দেখে তাকে তা করতে নিষেধ করত না। বরং তার সাথেই আসন গ্রহণ করে পানাহারে তার সহিত শরীক ও একাকার হয়ে যেত। আর সে যখন তা-ই করত, তখন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ-

আল্লাহ্ তাদের কতক লোকের প্রভাবে অন্য কতক লোকের দিলকে বিভ্রান্ত করে দিলেন।

এরপর রাসূলে করীম (স) এ আয়াতটি পাঠ করেনঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ - (المائده - ٧٨)

বনি ইসরাইল বংশের যে-সব লোক কাফির হয়ে গিয়েছিল, তাদের উপর দাউদ ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার জবানীতে অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে এজন্য যে, তারা নাফরমানী করেছে ও সীমালঙ্ঘন করার কাজে লিপ্ত থাকত।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, পাপী ব্যক্তির সাথে গভীর সম্পর্ক ও মেলামেশা রক্ষা করে চলা ও আন্তরিক বন্ধুত্ব পোষণ করা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। এটাও একটি অতি বড় ঘৃণ্য কাজ। আর ফাহ্‌শা, মুনকার ও বাগী—এই তিন তিনটির এবং এর কোন একটিও না করতে বলেছেন এ আয়াতেঃ

يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ - (النحل - ٩٠)

আল্লাহ্‌ নিষেধ করছেন নির্লজ্জতা, ঘৃণ্য ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করতে।

যিনা-ব্যভিচারকে কুরআনে 'ফাহেশা' বলা হয়েছে। এই শব্দের অর্থ নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা—তা যে কাজেই থাকবে, তা-ই ব্যভিচারের সমান অপরাধ বিবেচিত হবে। যারা জালিম তারাই সীমালঙ্ঘনমূলক অপরাধকারী। অতএব তা পরিহার্য। আল্লাহ্‌ এই সব কাজকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এই পর্যায়ের কাজগুলি যদি বাস্তবিকই নিষিদ্ধ না হত, তাহলে মানুষের পারস্পরিক জীবনে একবিন্দু শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা অবশিষ্ট থাকতো না। রক্ষা পেত না কারোর জান, মাল ও ইয্‌যত।

কুরআনের পরিভাষা হিসেবে ফাহ্‌শা, মুন্‌কার ও বাগী নৈতিক জীবনের সকল প্রকার খারাবীকে শামিল করে। এমন কোন অন্যায় কল্পনা করা যেতে পারে না, যাতে এই তিন তিনটি কিংবা এর কোন একটি শামিল নয়। তবে এর প্রত্যেকটির ব্যাপকতা সমান মাত্রায় নয়। যেমন 'ফাহ্‌শা শব্দটি এমন নির্লজ্জতা বোঝায়, যা মৌলিকভাবে ব্যক্তিসত্তায় সীমিত। বস্ত্রহীন নগ্ন থাকা যা ব্যভিচারের ন্যায় পাপ কাজে লিপ্ত থাকা ফাহ্‌শা। 'মুনকার' শব্দটি সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ের জীবন গ্রাসকারী পাপ বোঝায়। স্বামীর অত্যাচার স্ত্রীর উপর, পিতা-মাতার নির্মমতা সন্তানের প্রতি, সন্তানেরই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি মুন্‌কার। আর 'বাগী' সমাজ অতিক্রম করে দেশ ও মিল্লাতকে গ্রাস করে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম ইত্যাদি এই পর্যায়ে পড়ে।

এভাবে তিন তিনটি পাপ কাজের একটা বিন্যাস রয়েছে। এ তিন তিনটি অপর একটি বিন্যাস হতে পারে। তাতে প্রথমে যে সব খারাপ কাজ গণ্য হবে, যার দরুন পাপী আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আর শেষে আসে সে সব, যাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রিযামন্দী উঠে যায়।

আল্লাহ্‌ চাহেন, মানুষ এই সকল খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। এটা যেমন মানুষের উপর আল্লাহ্‌র হক। তেমনি মানুষের নিজের উপর নিজের হক। নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য হচ্ছে এই তিন পর্যায়ের খারাবী থেকে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা। নিজেকে ব্যক্তি হিসেবে ব্যক্তির এবং সমষ্টি হিসেবে পরিবারকে এইসব খারাবী থেকে দূরে রাখা। আদর্শ চরিত্রবান ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও জাতি হিসাবে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করা। এভাবেই আদায় হবে নিজের উপর নিজের হক্‌ এবং পালিত হবে নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য।

ব্যক্তি কেন্দ্রিক দোষসমূহ

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের উপর নিজের যে হক্‌ রয়েছে, নিজের প্রতি ব্যক্তির নিজের যে কর্তব্য রয়েছে, সেই দৃষ্টিতে এমন কতগুলি দোষ সম্মুখে আসে যেগুলি থেকে মুক্ত হওয়া ও থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় নিজের উপর নিজের হক্‌ আদায় হবে না, নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য পালিত হবে না। সর্বোপরি সর্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র যে 'হক্‌' ব্যক্তির উপর রয়েছে, ব্যক্তির যে কর্তব্য রয়েছে তার প্রতি, তারও পরিপন্থী হয়ে যাবে।

এখানে আমরা একত্রিশটি দোষ সম্পর্কে প্রশস্ততর আলোচনা পেশ করতে চেষ্ট করছি।

অহংকার ও গৌরব

এই পর্যায়ে সর্বপ্রথম আমরা অহংকার ও গৌরব সম্পর্কে বিশ্লেষণ পেশ করব। কোন একটি বিশেষ গুণ বা দক্ষতা কারোর মধ্যে থেকে থাকলে সে বিষয়ে সে স্বাভাবিকভাবেই সচেতন থাকবে। সে বিষয়ে সে মনে মনে অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করবে। মূলত সেটি কোন ত্রুটি বা দোষের ব্যাপার নয়। কিন্তু পরিণতিতে সে যদি সেই গুণটির দরুন নিজেকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করতে শুরু করে, যাদের মধ্যে সেই গুণটি নেই; কিংবা কম মাত্রায় আছে তাদেরকে সে নিজের তুলনায় যদি হীন ও নীচ মনে করতে শুরু করে, তাহলে সেটি হবে আত্মম্ভরিতা, হাম্‌বাড়ামী এবং তা প্রকাশ করতে শুরু করলে তা হবে অহংকার ও গৌরব। বিশ্ব ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই অহংকারের বাস্তব প্রকাশ

ঘটেছিল শয়তানের দ্বারা। সে নিজেকে আদমের তুলনায় উচ্চতর ও উত্তমতর মনে করেছিল। মুখে তার প্রকাশ করেছিল এই বলেঃ

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ – (الاعراف -١٢)

আমি তার তুলনায় অনেক ভাল ও উত্তম।

خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ – (الاعراف - ١٢)

হে আল্লাহ্‌, আমাকে তুমি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ, আর ওকে (আদমকে) সৃষ্টি করেছ মাটি দিয়ে।

অর্থাৎ মাটির চেয়ে আগুন অনেক ভাল। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট ইবলীসের এই অহংকার বরদাশত হল না। তিনি তাকে তাঁর দরবার থেকে বিতাড়িত করলেন। বললেনঃ

فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ – (الاعراف -١٣)

অতএব তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে তোর অহংকার করার কোন সুযোগ, কোন অধিকার থাকতে পারে না। তুই বে'র হয়ে যা। কেননা তুই হীন-সামান্য-নগণ্যদের একজন।

তবে তা পর্যায়ক্রমে আপেক্ষিক। প্রথমে নিজের বড়ত্বের চেতনা নিজের মনে পরবর্তীতে তা অন্যদের প্রতি ছোটত্ব আরোপে পল্লবিত। কেবল নিজেকে বড় মনে করেই মানুষ ক্ষান্ত থাকে না, সেই সাথে অন্যদেরকেও নিজের অপেক্ষা হীন ও নীচ জ্ঞান করতে শুরু করে। অতীব সুন্দর চেহারার এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেঃ আমি তো খুবই সুন্দর চেহারার মানুষ, সৌন্দর্য আমার খুবই প্রিয় জিনিস, সৌন্দর্যে কেউ আমার তুলনায় অধিক অগ্রসর হবে, তা আমি বরদাশ্‌ত করতে পারি না। আপনি বলুন, এটা কি আমার অহংকার? রাসূল (স) বললেনঃ না, প্রকৃত সত্যকে অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করা এবং অন্যদেরকে নিজের অপেক্ষা হীন জ্ঞান করাই অহংকার।

অহংকারের এই আপেক্ষিকতা তাকে নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে সকল চরিত্রহীনতার উৎস বানিয়ে দিয়েছে। এই আত্ম-বড়ত্ব বোধ-ই মানুষকে নবী-রাসূলের দ্বীনী দাওয়াত কবুল করতে বাধাগ্রস্ত করে। অন্যদেরকে দুর্বল অক্ষম

লোকদেরকে হীন জ্ঞান করে নিজের অধীন বানিয়ে নিতে ও রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। আর এরা সেই অহংকারীদের নেতৃত্বের চালে পড়ে নিষ্পেষিত হতে থাকে, নবী-রাসূলগণের দ্বীনী দাওয়াত কবুল করতে অসমর্থ থেকে যায়। ফিরাউন ও তার দলবলকে এই অহংকারের দরুন-ই হযরত মূসা ও হারুন (আ)-এর তওহীদী দাওয়াত কবুল করা থেকে বিরত রাখে।

فَا سْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَلِيْنَ- (المؤ منون -٤٦)

কিন্তু তারা অহংকার করল। আর তারা ছিল আত্মবড়ত্ব বোধে উচ্চতর।

এরাই অহংকারের দরুন অধীন লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত কবুল করতে ও দ্বীন অনুযায়ী জীবন যাপন করতে দেয় না, সাধারণ মানুষ এদের কারণেই দ্বীনী জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয়।

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ - (سبا -٣١)

দুর্বল অধীন হয়ে থাকা লোকেরা অহংকারী বড়ত্ব বোধকারী লোকদেরকে (কিয়ামতের দিন) বলবেঃ তোমরা না থাকলে আমরা তো অবশ্যই ঈমানদার হয়ে যেতাম।

অহংকারী লোকেরা অহমিকা ও আত্মম্ভরিতায় দিশেহারা হয়ে থাকে। তারা নিজেদেরকে শুধু বড় মনে করেই ক্ষান্ত থাকে না, অধীন অন্যান্য লোকদের মধ্যে ভক্তি ও বিরোধ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করতেও সার্বক্ষণিকভাবে সচেষ্ট থাকে। ওরা হয় স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী, দুর্ধর্ষ দুর্বিনীত। এরা কখনই আল্লাহ্র ভালবাসা পেতে পারে না।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَا لًا فَخُوْرًا- (النسا ء ٣٦)

আল্লাহ্ অহংকারী গৌরবকারী আত্ম-শ্রেষ্ঠত্ব বোধে মশগুল লোকদেরকে ভালবাসেন না।

এ অহংকারী লোকদের পরিণতি জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কেননা তারা আত্মম্ভরিতার দরুন-ই সত্য দ্বীন গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। প্রকৃত সত্য দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় না। তা প্রতিষ্ঠিত করার সকল চেষ্টা ও সংগ্রামকে পর্যুদস্ত ও বাধাগ্রস্ত করে দেয়। তাদেরই মনোভাব এই হয় যে, আমরা যা বলব, লোকেরা তা করতে বাধ্য। অন্য কোনখান থেকে কোন বিধান আসবে

ও এই লোকেরা তা-ই মানবে, আর আমাদের আইন অমান্য করবে, তা হতে পারে না, হতে দেয়া যায় না।

অহংকার ও গৌরবের সামাজিক ও নৈতিক প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ব্যাপক ও মারাত্মক। অহংকারী ব্যক্তি সাধারণ মানুষের সাথে কোন মিল-মিশ, উঠা-বসা ও এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করতে প্রস্তুত হয় না। নিজেকে অন্যান্য সকল লোক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে এক স্বতন্ত্র উচ্চতর ব্যক্তিত্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত ও প্রদর্শিত করতে সব সময় চেষ্টা করে। সাধারণ মানুষ তার প্রতি সম্মান দেখাক, তার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিনয় প্রদর্শন করুক এবং তার কথায় উঠুক ও বসুক—তা-ই তারা চায়। কিন্তু সে নিজে কারোর কথা শুনতে, কারোর প্রতি সম্মান দেখাতে প্রস্তুত হয় না। ফলে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি মারত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। বেশীর ভাগ লোকই হীনমন্যতার শিকার হতে বাধ্য হয়। আর কিছু লোকের অহংকার দর্পে তাদের মান মর্যাদা চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকে। এই জন্যেই নবী করীম (স) বলেছেনঃ যার দিলে একবিন্দু পরিমাণ অহংকারও স্থান পাবে, সে কখনই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (আবূ দাউদ, কিতাবুল লিবাশ)! ইমাম গাযালী (রা) এই হাদীসটির দার্শনিক ব্যাখ্যা পর্যায়ে বলেছেনঃ মুসল মানদের বিশেষ বিশেষ চরিত্রই জান্নাতের দ্বার পথ। অহংকার ও গৌরব সেই দ্বারসমূহকেই বন্ধ করে দেয়। এই কারণে যার দিলে বিন্দু পরিমাণও অহংকার বাসা বাঁধবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

মূলত এটা একটা মারাত্মক ধরনের অ-নৈতিকতা। তা সব শ্রেণীর লোকদের মধ্যে থাকা সম্ভব। তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সমাজে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর তীব্র শানিত উক্তি হাদীস গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত রয়েছে। সমাজের সম্যক নিয়ন্ত্রক ও নেতৃস্থানীয় লোকের সাধারণত এই মনোভাব পোষণ করে যে, সাধারণ মানুষ তাদের আনুগত্য করে চলুক, তাদের সম্মুখে বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুক। রাসূলে করীম (স) বলেছেন—এদের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়া উচিত। রাসূলে করীম (স) একবার লাঠিতে ভর দিয়ে ঘরের বাইরে আসলেন। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেনঃ অনারব (অমুসলিম) লোকদের ন্যায় সম্মান প্রদর্শনের জন্য তোমরা দাঁড়াবে না। (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব।)

অনুরূপভাবে নিজের নামের সাথে খুব বড় বড় উপাধি উপমা দেয়ায়ও অহংরের প্রকাশ ঘটে। অনেক সময় তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীনও হয়। অনৈসলামী

রাজা-বাদশাগণ নিজেদেরকে মালিকুল মুলক, জালালাতুল মালিক, শাহান শাহ্‌, হিজ হাইনেস ও হিজ এক্সেলেন্সি ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করে থাকে। অথচ নবী করীম (স) বলেছেন—আল্লাহ্‌র নিকট সব চাইতে খারাপ নাম হচ্ছে নিজেকে মালিকুল মূলক ও শাহান শাহ (জালালাতুল মালিক) এবং অনুরূপ অর্থবোধক শব্দে বলা। (বুখারী)

কুরআন মজীদে অহংকার ও গৌরবের সকল প্রকারকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

তুমি যমীনের উপর দর্প সহকারে চলাফেরা করো না। কেননা, তুমি পৃথিবীকে কখনই চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারবে না, পারবে না পর্বতের ন্যায় উচ্চ হতে।
(আল-ইসরাঃ ৩৭)

বলা হয়েছে, তুমি অহংকারের বশবর্তী হয়ে লোকদের জন্য নিজের মুখমন্ডল ঘুরিয়ে নিও না। যমীনের উপর দর্পের সাথে চলাফেরা করো না। কেননা আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিক কোন ব্যক্তিকেই পছন্দ করেন না, ভালবাসেন না।
(সূরা লুকমানঃ ১৮)

এর বিপরীত নম্রতা নিরহংকারতাকে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদের গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বলেছেনঃ রহমানের বিশেষ বান্দা যারা, তারা যমীনের উপর খুবই বিনয় নম্রতা নিরহংকারতা সহকারে চলাফেরা করে। এ জাহেল লোকেরা যখন তাদের সাথে জাহিলী কথাবার্তা বলতে (বা অকারণ তর্ক-বিতর্ক করতে) শুরু করে তখন তারা তাদের সালাম করে চলে যায়।
(ফুরকানঃ ৬৩)

অহংকার ও গৌরবের বহু কারণ থাকতে পারে। সাধারণত মানুষ বংশ, মান-মর্যাদা, রূপ-সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, দলবলের বিপুলতা ইত্যাদি নিয়ে গৌরব করে। ইসলাম এর প্রত্যেকটি সম্পর্কে চুড়ান্ত ভাবে বলে দিয়েছে যে, এর কোন একটিও এমন নয়, যা নিয়ে এক বিন্দু গৌরব বা অহংকার করা যেতে পারে।

কুরআন মজীদ বংশগৌরবের ভিত্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে এই বলেঃ

হে মানুষ! আমরা তোমাদের সকলকে একই পুরুষ ও নারী (আদম ও হাওয়া)-র বংশধর হিসেবে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি একান্তভাবে পারস্পরিক পরিচিতির উদ্দেশ্যে মাত্র।'
(আল হুজুরাতঃ ১৩)

তবে জন্মগতভাবে সব মানুষ অভিন্ন হলেও গুনগতভাবে মানুষে মানুষে পার্থক্য হতে পারে। সে গুণও অবশ্যই কোন বস্তুগত জিনিস নয়। তা একান্তভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এবং তা হচ্ছে 'তাকওয়া' —অন্তরে আল্লাহ্র ভয় পোষণ এবং তাঁর নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে বিরত থাকা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা। তাই আল্লাহ্ উক্ত কথার পরপর-ই বলেছেনঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ -

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তি। অর্থাৎ—যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন, সে অধিক সম্মানিত আল্লাহ্র নিকট ও মানুষের নিকট।

নবী করীম (স) একটি হাদীসে এই কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জাহিলিয়াতের সময়ের গৌরব, অহংকার ও বাপ-দাদা অর্থাৎ বংশ নিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের সব রীতিকে খতম করে দিয়েছেন। এক্ষণে শুধু দুই ধরনের মানুষই আছে—মু'মিন-মুত্তাকী এবং বদকার দুর্ভাগ্য। তোমরা সকলে আদমের সন্তান। আর আদম মাটি দিয়ে সৃষ্টি। লোকেরা এমন লোকদের দিয়ে বড়ত্ব যাহির করা যেন ত্যাগ করে, যারা জাহান্নামের কয়লা; কিন্তু আল্লাহ্র নিকট সে জন্তুর চাইতেও হীন-নিকৃষ্ট যা মুখে ময়লা চাটতে থাকে। (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব)

ইসলামের দৃষ্টিতে ধন ঐশ্বর্য সামষ্টিক ও তামাদ্দুনিক প্রয়োজনের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে কুরআনে তাকে 'খায়র' (প্রভুত কল্যাণময়) এবং 'কিয়াস' (যার উপর নির্ভর করে সমাজ প্রতিষ্ঠা পায় ও চলে) বলা হয়েছে। এই কারণে তা ধ্বংস ও বিনষ্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাকে রক্ষা করা ও কল্যাণময় কাজে ব্যয় বিনিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি কেউ যদি স্বীয় ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহতও হয় তাহলে সে শহীদ হওয়ার মর্যাদা লাভ করবে বলেও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেই ধন-সম্পদ নিয়ে কোনরূপ গৌরব অহংকার করাকে ইসলামে আদৌ পছন্দ করা হয়নি মূলত তা নিয়ে গৌরব করার কিছুই নেই। তা কারোর নিজস্ব কোন গুণ নয়, তা স্থায়ী কোন জিনিস নয়। তা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত তা থেকে কোন কল্যাণও পাওয়া যায় না। রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ তোমরা ধন-সম্পদ লাভের প্রতিযোগিতায় প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাচ্ছ। আদম সন্তান বলেঃ 'আমার ধন আমার দৌলত।' কিন্তু আসলে তোমার ধন-দৌলত তো শুধু এতটুকু, যতটুকু তুমি দান করেছ, কিংবা যতটুকু তুমি পানাহার ও পরিধান করে ব্যয় করেছ। (তিরমিযী, কিতাবুজ জুহদ)

অনুরূপভাবে শক্তি-বিক্রমও খুবই কল্যাণময়। সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কাজে কর্মে তার প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণ অসাধারণ ও অনস্বীকার্য। এ শক্তিও তো আল্লাহ্‌রই দান। তা দিয়ে তিনি মানবতাকে ধন্য করেছেন। বলেছেনঃ

اَللّٰهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً - (الروم - ٥٤)

আল্লাহ্ তো তিনিই যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টির সূচনা করেছেন, দুর্বলতার অবস্থা থেকে, অতঃপর এই দুর্বলতার পরে তোমাদেরকে শক্তি দান করেছেন—আল্লাহ্‌ই তো শক্তির দাতা। তাই শক্তিকে তিনি পছন্দ করবেন, তা-ই তো স্বাভাবিক। এই জন্যই তিনি শক্তি সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন সব মুসলিমকে। বলেছেনঃ

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَّا سْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ - (الا نفال- ٦٠)

এবং তোমরা শত্রুদের মুকাবিলার জন্য যতদূর পার শক্তি ও পালিত অশ্ব (যুদ্ধের যানবাহন সরঞ্জাম) সংগ্রহ কর তার সাহায্যে তোমরা আল্লাহ্‌র শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবে..।

অর্থাৎ জাতীয় শত্রু ও আল্লাহ্‌র শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করাই হচ্ছে শক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্য। নিজেদের অবৈধ ক্ষমতা স্থায়ীকরণ বা দুর্বল জনগণকে দমন করার কাজে তা ব্যবহার করা যেতে পারে না।

হাদীসেও শক্তির মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ শক্তিশালী মুসলমান আল্লাহ্‌র নিকট দুর্বল মুসলমানদের তুলনায় অধিক উত্তম, অধিক প্রিয়।' (মুসলিম, কিতাবুল কদর) কিন্তু তাই বলে শক্তি-ক্ষমতা নিয়ে গৌরব ও অহংকার করা—ইসলামে তা আদৌ সমর্থনীয় বা পছন্দনীয় নয়।

ধন-দৌলত ও শক্তি-সামর্থ্যের ন্যায় জন-বল ও সন্তানাধিক্যও ইসলামের গুরুত্বহীন বা অপ্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু এর কোন একটি নিয়ে যখন গৌরব অহংকার করা হয়, তখনই তা পরিত্যাজ্য হয়ে দাঁড়ায়। জাহিলিয়াতের সময় এই

ধন-মাল ও শক্তি-আধিপত্যের আধিক্য প্রাবল্য নিয়ে কাফির-মুশরিক গৌরব করত। একজন অপরজনকে বলতঃ

أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا – (الكهف -٣٤)

আমি তো তোমার অপেক্ষা অধিক ধন-সম্পদের অধিকারী, জনবলের দিক দিয়েও আমি তোমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।

কিন্তু এই গৌরব অহংকার আল্লাহ্র আদৌ পছন্দনীয় নয়। এইরূপ অহংকার ও গৌরবের তাৎক্ষণিক জবাবে বলা হয়ঃ

أَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰكَ رَجُلًا (الكهف - ٣٧)

তুমি কি সেই পরোয়ারদিগারকে অস্বীকার অমান্য করছ, যিনি তোমাকে প্রথমে মাটি থেকে পরে শুক্র কীট থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর তোমাকে এক ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি বানিয়ে দিয়েছেন?

অর্থাৎ মানুষের কোন কিছু নিয়ে অহংকার বা গৌরব করার আদৌ কোন অবকাশ নেই। কি নিয়ে সে গৌরব করতে পারে? তার নিজের সত্তার মৌল উপাদান তো মাটি থেকে নিঃসৃত। পর্যায়ক্রমে তা শুক্রকীটে পরিণত হয় এবং তার পরেই একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরী হয়ে থাকে। এমন হীন ও নিকৃষ্ট উপকরণ দিয়ে তৈরী সত্তার পক্ষে গৌরব অহংকারের কোন অধিকার থাকতে পারে কি? এই গৌরব অহংকার মানুষকে অনেক নীচ ও হীনতার মধ্যে নিয়ে যায়। যেমন বলা হয়েছেঃ

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ – (التكاثر - ٢-١)

তোমাদের ধন-মাল ও সন্তান-জনবলের বিপুলতায় পারস্পরিক প্রতিযোগিতা প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্ক একেবারে গাফিল-বেখেয়াল বানিয়ে দিয়েছে। আর এই অবস্থা থাকে তোমাদের কবরে পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সংখ্যাধিক্য ও জনবলের প্রাবল্য ইসলামে খুবই কাম্য। খোদ রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

(ابوداؤد كتاب النكاح)

তোমরা প্রেম-ভালোবাসা সম্পন্ন ও অধিক সন্তান দাত্রী নারী বিয়ে কর কেননা তাতে তোমাদের জনসংখ্যা বিপুল হবে এবং তোমাদের এই সংখ্যাধিক্য নিয়ে অপরাপর উম্মতের তুলনায় আমি বিপুল সংখ্যক প্রমাণিত হয়ে যাবে।

আলোচ্য অহংকার ও গৌরবের একটি সূক্ষ্মতম দিক হচ্ছে আত্মম্ভরিতা (Conceit) বা আত্মাভিমান (Vanity)। মানুষ যখন নিজের মধ্যে কোন ভালো গুণের বিপুলতা লক্ষ্য করে, তখন তা তার নিকট এতই ভাল লাগে যে, তার মন সে জন্য পাগল হয়ে উঠে। তখন নিজেকে সবার ও সব কিছু থেকে অতীব উত্তম এবং নিজকে ছাড়া অন্য সবাইকে অত্যন্ত হীন ও নগণ্য মনে হয়। মনে হয়, এটা তার নিজস্ব মহামূল্য সম্পদ এবং তা তার নিকট চিরদিনই থাকবে। অন্যরা এ সম্পদ থেকে একান্ত বঞ্চিত। এর-ই প্রাবল্য অহংকার রূপে প্রকাশ পায়।

হুনাইন যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা কাফিরদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। তা দেখে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে একটা আত্মম্ভরিতার সৃষ্টি হয়। দেমাগ জেগে উঠে। মনে মনে নাচতে থাকে এই কথা ভেবে যে, এবার আর আমাদের সাথে কেউ পেরে উঠবে না। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলিম বাহিনীর এই আত্মম্ভরিতা দূর হয়ে গেল। তখন তারা মনে প্রাণে আল্লাহ্র সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করতে লাগলেন। ফলে তাদের পরাজয় মুহূর্ত বিজয়ে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই কথাই আল্লাহ্ বলেছেন এ আয়াতেঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَ تُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَا قَتْ
عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِ يْنَ – (التوبه – ٢٥)

এই সেইদিন হুনাইন যুদ্ধের দিন তোমাদের সংখ্যাবিপুলতা তোমাদেরকে আত্মম্ভরী বানিয়ে দিয়েছিল কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে-ই আসেনি। পৃথিবী বিপুল, বিস্তৃত ও বিশাল থাকা সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল। আর তোমরা পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে গেলে। (পরে সে আত্মম্ভরিতা দূর হয়ে গেলে আল্লাহ্র সাহায্য আসে)।

এই কারণেই মুসলিম মুজাহিদদের এই চিরন্তন শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ্ঃ

وَلَا تَكُوْ نُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَ جُوْا مِنْ دِيَا رِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ –
(الانفال – ٤٧)

এবং তোমরা সেই লোকদের মত হবে না, যারা নিজেদের ঘড়বাড়ি-দেশ থেকে অহংকার ভরে ও লোক দেখানো ভঙ্গীতে বের হয়ে আসে।

কোন জাতি, জনগোষ্ঠী বা সমাজে যখন সভ্যতার ব্যাপকতা, ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য ও সুখ সাচ্ছন্দ্য সাধারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেখানকার ব্যক্তিদের মধ্যে স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা প্রচন্ড হয়ে উঠে। তখন তারা আল্লাহ্‌র হক্‌ ভুলে যায়, নিজেদের মধ্যে আত্মভোলা ভাব জেগে উঠে। অন্যান্য মানুষেরও যেসব হক্‌ তার উপর রয়েছে, তার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শিত হতে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিই মোহাবেশে আবিষ্ট হয়ে স্বীয় ধন-দৌলতের অহংকারে মেতে উঠে। আর তা-ই হয় তার ধ্বংসের কারণ। বলেছেনঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا (القصص - ٥٨)

এমন বহু জনপদকেই তো আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, যেখানকার লোকদের জীবন যাত্রা দাম্ভিকতায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

এ তো দুনিয়ার ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কতিপয় জনপদ সম্পর্কিত কথা। কিন্তু এমন একদিন অবশ্যই আসবে যেদিন গোটা বিশ্বলোক তথা সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই দিনের যেসব পূর্বলক্ষণ দেখা দিবে বলে নবী করীম (স) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন,তার মধ্যে একটি হচ্ছে, প্রত্যেকেরই নিজের অভিমত সবচাইতে ভাল বলে মনে হবে এবং সেই মতে অবিচল থেকে তার উপর গৌরব করবে, নিজের বাহাদুরী দেখাবে। আর সেটাই হচ্ছে এমন সময়, যখন প্রত্যেকেরই নিজের পরিণতি সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। (আবূ দাউদ, কিতাবুল মালাহিম)

বস্তুত কুরআন মজীদে এই বিষয়ে যে সব আয়াত এসেছে, সেই সব সামনে রেখে চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অহংকার, গৌরব, দাম্ভিকতা, আত্মম্ভরিতা, অহমিকা একটা ধোঁকা বৈ কিছুই নয়। এই ধোঁকায় যদ্দিন মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তদ্দিন টের-ই পাওয়া যায় না যে, ব্যক্তি বা সমষ্টি একটি মারাত্মক ধরনের ধোঁকায় ডুবে আছে। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে যখন এই ধোঁকার আবরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তখন নিজেকে বা নিজেদের সামলানোর কোন সময়ই অবশিষ্ট থাকে না। ব্যক্তি জীবনে এই ধোঁকা একটা চরম লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে এই ধোঁকা সর্বাত্মকভাবে ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দেয়।

এই ধোঁকায় পড়ে ব্যক্তি পারে না তার নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করতে এবং নিজের উপর নিজের যে 'হক্‌' রয়েছে, তা আদায় করতে। অনুরূপভাবে একটি সমাজ বা জাতিও এই ধোঁকায় পড়ে পারে না নিজের উপর

নিজের হক্‌ আদায় করতে, নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করতে। কেননা নিজেকে পরিণামে কোন বিপদে নিক্ষেপ না করা—সকল প্রকার বিপদ-আপদ ও অসুবিধা থেকে নিজেকে রক্ষা করা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের উপর নিজের হক, নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য। ব্যক্তিগতভাবে যেমন, সমষ্টি ও জাতিগতভাবেও এই কথা। অন্যথায় সে হবে নিজের উপর জালিম—ব্যক্তিগতভাবে যেমন, সমাজ-সমষ্টি ও জাতিগতভাবেও তেমন।

আর কোন ব্যক্তি নিজের উপর জুলুম করবে, কোন জাতি করবে নিজের উপর জুলুম, তা কখনই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না, তা কল্পনীয় নয় এবং তা নয় মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যশীল।

হিংসা

আল্লাহ্‌ যদি কারোর প্রতি দয়া করে কোন বিশেষ নিয়ামত, গুণ বা সম্পদ দান করেন, তা দেখে অন্য ব্যক্তির মনে যদি অনুরূপ গুণ বা সম্পদ অর্জনের বাসনা জাগে তাহলে সেটা দোষের তো নয়-ই; বরং সেটি একটি গুণ বটে। সমাজ-জীবনে তা শুধু কাম্য নয়, তা সামাজিক উন্নতি অগ্রগতির একটি ফ্যাক্টরও বটে। নৈতিকতার দৃষ্টিতে তা খুবই পছন্দনীয়, সন্দেহ নেই।

কিন্তু কারোর মনে যদি এই ভাব জেগে উঠে যে, তার গুণ ও সম্পদ তার নিকট থেকে বিলীন হয়ে যাক এবং তার নিকট থেকে সব তার নিজের হাতে এসে যাক, তাহলে তাকে বলা হয় হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা। তাতে নিজের কোন কল্যাণ সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

মদীনার ইয়াহুদীরা যখন দেখতে পেল, মুসলমানরা বিশ্বনবী (স)-এর নেতৃত্বে ও আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআনের দৌলতে একটি উদীয়মান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, তখন তাদের মনে এই হিংসাই জেগে উঠেছিল। তাদের দিল এই হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হচ্ছিল অহর্নিশ। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (النسا - ٥٤)

ওরা কি মুসলিম জনগণকে হিংসা করে তাদেরকে আল্লাহ্‌র দেয়া এই অনুগ্রহের কারণে?

অর্থাৎ তারা অন্তর দিয়ে কামনা করত, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র দেয়া এই

নিয়ামত কেড়ে নেয়া হোক এবং তারাও তাদেরই মত লাঞ্ছিত-অপমানিত ও সর্বহারা হয়ে যাক। বলা হয়েছেঃ

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْ نَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَا نِكُمْ كُفَّارًا - حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ - (البقره -١٠٩)

হে মুসলিমগণ! আহলি কিতাবের অধিকাংশ লোকই নিজেদের দিলে নিহিত হিংসার কারণে চায় যে, তারা তোমাদের ঈমান গ্রহণের পর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে কাফির বানিয়ে দেবে।

হিংসা তিন প্রকারেরঃ

১. এক ব্যক্তির মনে কামনা এই হয় যে, অন্য ব্যক্তির লব্ধ নিয়ামত চুরি হয়ে যাক, সে তা পাক আর না-ই পাক। সে নিজেও হয়ত তা পাওয়ার কামনা করে না। এ এক হীন ও অত্যন্ত সাংঘাতিক ধরনের হিংসা-পরশ্রীকাতরতা, সন্দেহ নেই। এই কারণে মুনাফিকদেরও মনের ঐকান্তিক কামনা ছিল যে, মুসলমানরাও যেন তাদেরই মত কাফির হয়ে যায়।

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْ نُوْنَ سَوَاءً (نساء - ٨٩)

মুনাফিকরা অন্তর দিয়ে কামনা করে যে,তোমরাও যেন কাফির হয়ে যাও, যেমন তারা নিজেরা কাফির হয়ে গেছে। তাহলে তোমরা তাদের সাথে অভিন্ন হয়ে যাবে।

২. একজনের মনে বাসনা জাগে যে, অন্য জনের লব্ধ নিয়ামত সে লাভ করুক; এরূপ অবস্থায় তার আসল লক্ষ্য তো হয় নিয়ামতটা লাভ করা; কিন্তু অনেক সময় তা লাভ করা কেবল তখনই সম্ভব হয় যখন তা সেই ব্যক্তির নিকট থেকে কেড়ে নেয়া হবে, এই কারণে তার মনে কামনা জাগে যে, সেই নিয়ামত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে হরণ করা হোক।

৩. কারোর মনে এই কামনা জাগে যে, সে-ও নিয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তির মতই নিয়ামত লাভ করুক; কিন্তু তার অধিকারী ব্যক্তির নিকট থেকে তা কেড়ে নেয়ার বা তার নিকট থেকে তা হরণ হয়ে যাক, এই কামনা তার মনে জাগে না।

পূর্বেই বলেছি, এই তিন প্রকারের হিংসার মধ্যে প্রথম প্রকারের হিংসা সর্বাধিক নিকৃষ্ট ধরনের দ্বিতীয় প্রকারের হিংসায় মূল নিয়ামতটা নিঃশেষ হওয়ার

বাসনা থাকে না বলে প্রথমটিকে 'হিংসা' বলা যায় না। তা সত্ত্বেও কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ - (نساء - ٣٢)

আল্লাহ্‌ যে তোমাদের কতককে অপর কতকের উপর অতিরিক্ত অনুগ্রহ দিয়েছেন, সেজন্য তোমরা মনে কোন কামনা পোষণ করো না।

এ থেকে বোঝা যায়, একজন যে নিয়ামত লাভ করেছে, ঠিক সেই নিয়ামতটাই পাওয়ার জন্য কামনা করা খুব একটা পছন্দনীয় কাজ নয়। অবশ্য অনুরূপ নিয়ামত পাওয়ার বাসনা পোষণ করা কিছু মাত্র অন্যায় নয়। বলেছেনঃ

وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ -

তোমরা বরং আল্লাহ্‌ নিকট থেকে তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা কর।

এই তৃতীয় অবস্থাটি দোষের নয়; বরং দ্বীনের ক্ষেত্রে এটা প্রশংসনীয়। শরীয়তের কাজে এটা একটা প্রতিযোগিতা পর্যায়ের ব্যাপার।

হিংসার উদ্রেক হয় সাতটি কারণেঃ

১. বিদ্বেষ-ঘৃণা ও শত্রুতা। কেননা এক ব্যক্তির নিকট তার শত্রুর ভাল ও মন্দ উভয়েই অভিন্ন গণ্য হবে, তা সম্ভব নয়। এই কারণে ব্যক্তির স্বাভাবিক কামনা হয় যে, তার শত্রু যদি বিপদে পড়ে, তখন তার মনে আনন্দ ও উল্লাস জাগে। কিন্তু তা না হয়ে সে যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করে, তাতে সে দুঃখিত হয়। এটাকেই হিংসা বলা হয়।

কাফির ও মুনাফিকরা মুসলমানদের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণ করত। আর তা-ই এই হিংসাত্মক উপায়ে প্রকাশ পেত।

وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ - (ال عمران-١١٨)

তোমরা কষ্টের মধ্যে পড়, এটাই ওরা কামনা করে। শত্রুতা ও ঘৃণাবিদ্বেষ ওদের মুখ থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। আর তাদের দিলের মধ্যে যে ক্রোধ ও আক্রোশ পুঞ্জিভূত হয়ে আছে, তা তার চেয়ে আরও বড় ও সাংঘাতিক।

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا –
(ال عمران – ١٢٠)

তোমরা যদি কোন মঙ্গল বা কল্যাণময় অবস্থা পেয়ে যাও, তাহলে সেটা তাদের খারাপ লাগে। আর তোমরা যদি কোন দুঃখ বা আঘাত পাও, তাহলে তারা খুবই খুশী হয়ে যায়।

শত্রুতা ও বিদ্বেষ-আক্রোশের ফলে যে হিংসা জেগে উঠে, তাতে সংশ্লিষ্ট লোকদের পরস্পর সমান হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, একজন সাধারণ মানুষও বহু বড় ব্যক্তির অকল্যাণকামী হতে পারে।

২. হিংসার দ্বিতীয় কারণ হয় ব্যক্তিগত গৌরবের ভিত্তিহীন ভাবধারা। সমান সমান পর্যায়ের কোন ব্যক্তি যখন উচ্চতর পদে বা মর্যদায় অভিষিক্ত হয়, তখন তা তার সমর্পযায়ের লোকদের পক্ষে অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়, তার এই উন্নতি ও সৌভাগ্য তারা বরদাশত করতে পারে না। তাই সে মর্যাদা ও পদ তার নিকট থেকে কেড়ে নেয়া হোক-সে তা থেকে বঞ্চিত হোক, যেন তারা তার সমান হয়ে থাকতে পারে, এটাই হয় তাদের মনের কামনা ও বাসনা।

৩. হিংসার তৃতীয় কারণ এই হয় যে, এক ব্যক্তি যখন কাউকে নিজের অধীন ও অনুগত বানিয়ে রাখতে চায়, আর সে যদি এমন কোন মর্যাদা পেয়ে যায় যার দরুন সে আর তার অধীন ও অনুগত হয়ে থাকবে না বলে আশংকা জাগে, তখন কামনা করে যে, সে সেই প্রাপ্ত মর্যাদা হারিয়ে ফেলুক, তা হলেই সে তার অধীন ও অনুগত হয়ে থাকবে। কুরাইশরা মুসলমানদের প্রতি এই ধরনের হিংসাই পোষণ করত। তারা বিদ্রূপ করে বলতঃ

اَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا – (الانعام –٥٣)

আরে, আমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ বুঝি ওদের প্রতিই অনুগ্রহ বর্ষণ করলেন (আল্লাহ্ আর লোক পেলেন না)।

এ ধরনের হিংসা ও বিদ্বেষ বড় বড় লোকদের মধ্যে জেগে উঠে। নিজেদেরকে বড় মনে করা ও অন্য লোকদেরকে হীন জ্ঞান করার পরিণতিতেই তা হয়ে থাকে।

৪. হিংসার চতুর্থ কারণ হচ্ছে, লোকেরা নিজেদের অহমিকা বোধের দরুন যে লোককে খুবই সাধারণ মনে করে, সে যদি কোন অসাধারণ মর্যাদা পেয়ে বসে,

তখন তাদের মনে এক প্রকারের বিস্ময় বোধ জাগে। আর তার দরুন তার সেই মর্যাদা প্রাপ্তিকে সে কিছুতেই মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না। বরং সে তা অস্বীকার করে। কাফিররা এই হিংসার কারণেই নবী-রাসূলগণের নবুয়্যাত ও রিসালাত প্রাপ্তিকে অস্বীকার করে, বিস্ময় প্রকাশ করে বলেঃ

اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا – (بنى اسرا ئىل - ٩٤)

আরে, একজন মানুষকে আল্লাহ্ রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন নাকি?

৫. হিংসার পঞ্চম কারণ হচ্ছে, দুই ব্যক্তির উদ্দেশ্য যখন একই হয়, তখন উভয়ই পরস্পরকে হিংসার চোখে দেখে। পরে তাদের একজন যখন সে উদ্দেশ্য পেয়ে যায়, তখন অপরজন স্বাভাবিকভাবেই তার অকল্যাণকামী হয়ে উঠে। একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে এবং এক পিতার অনেক কয়জন সন্তানের মধ্যে, এক শ্রেণীর বহু সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে, একই দলের বহু সংখ্যাক সমমানের কর্মীর মধ্যে সাধারণত এই হিংসাই পরিলক্ষিত হয়। একই সময়ের বহু আলেমের মধ্যেও কখনও কখনও এই হিংসাই দেখা যায়। হযরত ইউসুফের ভাইদের মধ্যেও এই হিংসাই দেখা দিয়েছিল ইউসূফ তাঁর পিতার নিকট অন্যদের অপেক্ষা অধিক স্নেহভাজন ছিল বলে।

৬. হিংসার ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রাপ্তির লালসা। কেউ যখন এই ক্ষেত্রে একক ও অনন্য হতে চায়, তখন যদি সে জানতে পারে যে, অন্য কোন ব্যক্তি তার প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে, তাহলে তখন তার নিকট তা অসহ্য হয়ে উঠে। তখন তার মনে এই বাসনা জাগে যে, যে লোক এই প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রাপ্তিতে তার সাথে শরীক বা প্রতিদ্বন্দ্বী, সে তা থেকে বিরত হোক বা বঞ্চিত হয়ে যাক এবং সে একাই এক্ষেত্রে একক ও অনন্য হয়ে থাকুক।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীরা এই কারণেই হিংসা পোষণ করত যে, ইসলামের পূর্বে ইয়াহুদীরা তদানীন্তন আরব সমাজে ধর্মীয় ইল্‌ম ও সামাজিক প্রাধান্যে অনন্য হয়েছিল, ইসলামের যুগে মুসলিমগণ তাদের প্রাধান্য দখল করে নিচ্ছিলেন এবং ইয়াহুদীরা তা হারাতে শুরু করেছিল। এর কারণে তারা ইসলামের সাথেই শত্রুতা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ইসলামের পূর্বে মদীনাবাসীরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে মদীনার বাদশাহ্ বানাবার সিদ্ধান্ত করেছিল, কিন্তু ইসলামের কারণে তা আর হয়ে উঠলো না। তাই ইবনে উবাইর মনে ইসলাম, রাসূলে করীম (স) এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আক্রোশ জেগে উঠে।

৭. হীন ও নীচ মন-মানসিকতা হচ্ছে হিংসার সপ্তম কারণ। কোন কোন লোক জন্মগতভাবেই এমন হয় যে, সে কারোরই ভাল দেখতে পারে না, কারোর ভাল দেখলে সে যেন আক্রোশে ফেটে পড়তে উদ্যত হয়। আর কাউকে বিপদে জর্জরিত দেখতে পেলে খুবই আনন্দিত হয়। এসব ক্ষেত্রে হিংসার উদ্রেক হওয়ার কোন বিশেষ কারণের প্রয়োজন হয় না, হীন মন-মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি-ই হিংসায় জ্বলতে থাকে।

কিন্তু ইসলাম যে আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নাযিল হয়েছে, তাতে এই ধরনের কোন হিংসারই একবিন্দু স্থান থাকতে পারে না। ইসলাম মুসলিম জনগণের মধ্যে পরম ও আন্তরিক ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগাতে চায়। এই কারণে পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির সকল কারণকেই উৎপাটিত করতে চায়। নবী করীম (স) হিংসার সকল প্রকারের কারণ থেকে মুসলমানদের দূরে সরে থাকার নসীহত করেছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

اِيَّا كُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِ يْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَاتَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَا سَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَاتَبَا غَضُوْا وَكُوْ نُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا –

(بخاری – کتاب الادب)

তোমরা পারস্পরিক খারাপ ধারণা পরিহার কর। কেননা খারাপ ধারণা অত্যন্ত মিথ্যা কথা মাত্র। লোকদের দোষ বের করার জন্য ওঁৎ পেতে থেকো না, পরস্পরে হিংসা করো না, একজন অপরজনের পিছে লেগে যেও না, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ জাগতে দিও না। বরং হে আল্লাহ্‌র বান্দারা, তোমরা পরস্পরের ভাই হয়ে যাও।

হাফেজ ইবনে হাজার আল-আসকালানী লিখেছেনঃ নবী করীম (স)-এর মহান বাণীর তাৎপর্য হচ্ছে, তোমরা এসব নিষিদ্ধ ও হীন কার্যাবলী পরিহার কর, তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌র সঠিক বান্দা ও পরস্পরের ভাই হতে পারবে। এই দোষগুলি পরিহার না করা হলে তোমরা পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হবে। ভাই ভাই হওয়ার অর্থ হচ্ছে, যে সব শুভ গুণের দরুন পরস্পর ভাই-ভাই হতে পার, তোমরা সেই গুণসমূহ নিজেদের মধ্যে অর্জন কর।

বস্তুত হিংসা এক নিকৃষ্ট ধরনের চরিত্রহীনতা। তা যে ব্যক্তির মনে জাগে সে ব্যক্তির অন্তরকে কলুষিত করে। তাকে হীন ও নীচ আচার-আচরণ করতে বাধ্য করে। এই হিংসার আগুনে কত মানুষ যে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, তার

কোন ইয়ত্তা নেই। এই জন্যই রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

اِيَّا كُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ- (ابو داؤد- كتاب الادب)

তোমরা নিজেদেরকে হিংসা থেকে বাঁচাও (হিংসাকে প্রশ্রয় দিও না)। কেননা হিংসা সকল নেক ও কল্যানময় কাজকে ঠিক তেমনিভাবে খেয়ে ফেলে নিষ্ফল করে দেয়, যেমন করে আগুন কাষ্ঠ খন্ডকে ভস্ম করে।

হিংসাকারী ব্যক্তি মনে করে, এটা তার একটা ন্যায্য অধিকার, সে এই হিংসার দ্বারা নিজেকে লাভবান করছে। কিন্তু না, হিংসাকারী নিজে হিংসার দ্বারা কিছুমাত্র লাভবান হয় না, হয় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। মনে করে সে হিংসিত ব্যক্তির উপর দিয়ে তার আক্রোশ মেটাচ্ছে, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কিন্তু না, হিংসা করে হিংসিত ব্যক্তির প্রকৃতই কোন ক্ষতি করতে পারে না।

পূর্বের বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায়, হিংসা প্রথমে ব্যক্তির মনে জাগে তারপর তা অন্যের প্রতি আরোপিত হয়, তখন হিংসা ব্যক্তিগত গন্ডি ছাড়িয়ে পারস্পরিকতার ক্ষেত্রে নেমে আসে। যখন তা ব্যক্তিগত গন্ডির মধে থেকে হিংসুক ব্যক্তির হৃদয়-মনে সকল কোমল মানবিক ভাবধারাকে ভস্ম করতে থাকে, তখন সে এই হিংসার দরুন আত্ম-ধ্বংসকারী হয়, নিজের উপর নিজের অধিকার—নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য বিনষ্ট করে। আর যখন তা পারস্পরিক ক্ষেত্রে আসে, তখন তদ্দ্বারা অন্য লোকের হক বিনষ্ট করে।

কাজেই হিংসা এক মারাত্মক রোগ, তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। পানাহ চাইতে হবে আল্লাহ্র নিকট।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ -

হিংসুক যখন হিংসা করে, তখন তার সমস্ত ক্ষতিকর দিক থেকে পানাহ চাই হে আল্লাহ্, তোমার নিকট।

অশ্লীল কথাবার্তা বলা

অশ্লীলতা সর্ব পর্যায়েই ঘৃণ্য ও পরিহার্য। অশ্লীলতার অতি নিকট সম্পর্ক রয়েছে যৌন লালসা পংকিলতার সাথে। মুখে অশ্লীল কথাবার্তা তখনই উচ্চারিত হয়, হতে পারে যখন ব্যক্তির মন-মানসিকতা যৌন ভাবধারা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে চারপাশ থেকে উপচে পড়তে শুরু করে।

যাদের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান নেই, নৈতিক পবিত্রতার কোন চেতনা নেই, পরকালের কোন ভয় নেই, সামাজিক অতি সাধারণ লাজ-লজ্জাটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাদের মুখে লাগামহীনভাবে অশ্লীল কথাবার্তার খৈ ফোটে।

এসব অশ্লীল কথাবার্তার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত থাকে কোন-না-কোন নারীর যৌন দিক সম্পর্কে। নারীর রূপ-সৌন্দর্যও অনেক সময় অশ্লীল কথাবার্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে। তাতে তার নানা অবস্থার উল্লেখও হয়ে থাকে, যা খুবই লজ্জাকর ব্যাপার। আরবী ভাষায় رفث বলা হয়। কুরআন মজীদে হজ প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَاجِدَالَ فِى الْحَجِّ – (البقره - ١٩٧)

অতএব হজ-এর দিনসমূহে না অশ্লীল যৌন পংকিলতাপূর্ণ কোন কথা বলা যাবে, না শরীয়ত লঙ্ঘনের কোন-না-কোন ঝগড়া ফাসাদের কাজ।

এই অশ্লীল ও নারীর যৌনতার দিকে ইঙ্গিতবহ কথাবর্তা কেবল হজ-এর দিনসমূহে করা যাবে না তাই নয়, সাধারণভাবে সকল সময়ের জন্যই তা নিষিদ্ধ। উক্ত আয়াতে হজ-এর কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে শুধু এজন্যই যে, এ সময় পুরুষ ও নারীর ব্যাপক সমাবেশ ও খোলা-মেলা মিলিত একত্রিত হওয়ার সুযোগ হয়ে থাকে, দীর্ঘ পথ বিদেশ সফর করতে হয় উভয়কেই, তাতে পর্দার রীতিনীতি পালন করা খুবই কষ্টকর—অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়ে থাকে। এই কারণে পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই অশ্লীলতার বিকার দেখা দিতে পারে। অন্যথায় তা সাধারণভাবেই নিষিদ্ধ।

ইসলামী সমাজে অশ্লীল কথাবার্তার কোন অবকাশ নেই। তা ব্যক্তির মনে কলুষতারই প্রকাশ করে না, গোটা পরিবেশ পরিমন্ডলকেও পংকিল কর তোলে। তাতে আল্লাহ্‌-নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত হয়। তবে একান্তই প্রয়োজনীয় অবস্থায় নিছক ইশারা ইঙ্গিতে কিছু বললে তা অবশ্য নিষিদ্ধ নয়, কুরআন মজীদে এই পর্যায়ের জরুরী কথা বলতে গিয়ে ইঙ্গিত ব্যবহার করা হয়েছে, লজ্জার সীমা লংঘন করা হয়নি।

নির্লজ্জ অশ্লীল কথাবার্তার আর একটি দিক হচ্ছে প্রচণ্ড ক্রোধ ও আক্রোশ প্রকাশ করার জন্য গালাগাল উচ্চারণ করা। গালাগাল বিশেষ করে অশ্লীল গালাগাল সামাজিক পংকিলতা নিয়ে আসে। ক্রোধ আক্রোশে অন্ধ হয়ে মানুষ মুখে অশ্লীল গালাগাল উচ্চারণ করে। তখন সে মনে করে, একটা কাজের মত কাজ করেছি। মনের ঝাল সবই যেন মেটাতে চায় এই গালাগাল দিয়ে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে, সামনা-সামনিও দেয়, দেয় তার অনুপস্থিতিতেও।

সামনা-সামনি এই গালাগাল দিলে গোটা পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠে। সামাজিক কলুষতা ব্যাপক হয়ে উঠে।

গালাগালের নানা ধরন ও রূপ রয়েছে। ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে তার বাপ মাকে গাল দিয়েও অনেকে ঝাল মিটায়। তার গোটা বংশকেই হীন প্রমাণ করতে চেষ্টা চালায়। কুরআন মজীদ মোটামুটিভাবে এই সব ধরনের গালাগালকে 'আল্ জিহ্রু বিস্ সুয়ে' বলে স্পষ্ট নিষেধ বাণী উচ্চারণ করেছে। বলেছেঃ

لَايُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ - (نساء - ١٤٨)

আল্লাহ্ তা'আলা নির্লজ্জতা প্রকাশকারী কথাবার্তা মোটেই পছন্দ করেন না।

'জিহ্রু বিস্ সূয়ে' অর্থ কারোর খারাপ ও মন্দ দিক প্রকাশ করা, উচ্চৈস্বরে বলা। অশ্লীল গালাগাল এই পর্যায়ের একটি ব্যাপার। তা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না অর্থাৎ আল্লাহ্ তা করতে নিষেধ করেছেন। তা করা হলে আল্লাহ্র ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। আর আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার মত দুর্ভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না।

এই কারণে কুরআন হাদীসে খারাপ কথাবার্তা না বলার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তার একটা বড় কারণ এই যে, সাধারণত একজন একটি গালি দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার চাইতে অধিক তীব্র ও অধিক অশ্লীল গালি উচ্চারণ করে থাকে। তাতে অশ্লীলতারই ব্যাপকতা বাড়ে, চতুর্দিক বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে। এই কারণে কোনরূপ গালাগাল না করাই বাঞ্ছনীয়। এমন কি আল্লাহ্ তো মুশরিকদেরও গালাগাল করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেনঃ

لَاتَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ -
(الا نعام - ١٠٨)

তোমরা সেই লোকদের গাল-মন্দ দিও না, যারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যদের ডাকে, ইবাদত করে, কেননা তোমরা তাদের গাল দিলে তারাও শত্রুতাবশত কোনরূপ জ্ঞান-বুদ্ধি ছাড়াই তোমাদের গালমন্দ করবে।

১. এই কথাটি রাসূলে করীম (স) এভাবে বলেছেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হচ্ছে ব্যক্তির তার বাপ-মার উপর কি করে অভিশাপ বর্ষণ করতে পারে? বললেন, তা করে এ ভাবে যে, যখন একজন অপরজনের বাপ-মাকে গাল দেয়, তখন সেও

তার বাপ-মাকে গাল দেয়, মন্দ বলে। আর এভাবে একজন লোক তার নিজের বাপ-মাকে অভিশাপ দিয়ে থাকে। (বুখারী কিতাবুল আদব)

২. যে ব্যক্তি মুখ খারাপ করে গালাগাল উচ্চারণ করে সে সামাজিক সামষ্টিক জীবনের কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। সে লোকদের দৃষ্টিতে হয় অপমানিত। লোকেরা তাকে ভালোবাসে না, পছন্দ করে না, তার প্রতি সম্মান বোধ করে না। হাদীসে উদ্বৃত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হল। তিনি লোকটিকে দেখলেন। বললেনঃ লোকটি তার গোত্রের মধ্যে খুবই খারাপ ব্যক্তি। সে যখন তার নিকট এলো, তখন তিনি তার সাথে খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন, হাসিমুখে কথাবার্তা বললেন। সে যখন চলে গেল তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আপনি যখন লোকটিকে দেখলেন, তখন বললেন লোকটি ভাল নয়। কিন্তু পরে আপনি তার সাথে খুবই ভাল ও সম্মানজনক ব্যবহার করলেন, তার কারণ কি? নবী করীম (স) বললেনঃ আয়েশা, তুমি আমাকে খারাপ কথা বলার ও খারাপ ব্যবহার করার লোক রূপে কবে দেখেছ? আল্লাহ্র নিকট কিয়ামতের দিন সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি হবে সে, যার কুৎসিত কথাবার্তার জন্য লোকেরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তাকে পরিত্যাগ করবে। (বুখারী, কিতাবুল আদব)

এ থেকে বোঝা গেল যে, খারাপ লোকের সাথেও খারাপ ব্যবহার বা কথাবার্তা বলা উচিত নয়।

৩. অশ্লীল কথাবার্তা মূর্খতার লক্ষণ, বর্বর যুগের স্মারক এবং সভ্যতা ভব্যতা ও শালীনতার পরিপন্থী। একজন সাহাবী তাঁর ক্রীতদাসকে তার মা'র কথা বলে গাল দিলেন। নবী করীম (স) তা শুনে বললেনঃ তোমার মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগের অভ্যাস এখনও রয়ে গেছে?

৪. লাজ-লজ্জা ও শালীনতা, ভদ্র কথাবার্তা উত্তম চরিত্রের অংশ। ইসলাম বিশেষভাবে তার শিক্ষা দিয়েছে। মুখে খারাপ কথাবার্তা বলা তার স্পষ্ট বিপরীত। কিছু সংখ্যক ইয়াহুদী রাসূলে করীম (স)-এর দরবারে এসে 'আস্সালাম'-এর পরিবর্তে 'আস্সাম আলাইকুম' (তোমাদের মৃত্যু আসুক) বললে হযরত আয়েশা (রা) তা শুনে তার চাইতেও কিছুটা খারাপ কথায় উত্তর দিলেন। নবী করীম (স) শুনে বললেন, হে আয়েশা, নম্রতা অবলম্বন কর, কঠোরতা, নির্মমতা ও খারাপ কথা পরিহার কর।

৫. গালাগাল নিষিদ্ধ হওয়ার মূলে এই সূক্ষ্ম কারণও নিহিত রয়েছে যে, তাতে সাধারণত নির্লজ্জ ও বেহায়া কথাবার্তা ও উক্তি শব্দের আকারে মুখে উচ্চারিত

হয়। তাতে সমাজের লোকদের মধ্যে অশ্লীল কথাবার্তা শুনবার ও সত্য করার অভ্যাস হয়ে যায়। এভাবে অশ্লীল কথা ধীরে ধীরে কাজে পরিণত হয়ে যায়। এই জন্য নবী করীম (স) বলেছেনঃ

অশ্লীল ও নির্লজ্জ কথাবার্তা যে জিনিসে শামিল হবে, সে জিনিসকেই কুৎসিৎ করে দেবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল বিররে আস্‌সিল্লাহ্‌)। বোঝা গেল, কুৎসিৎ ও নির্লজ্জ কথাবার্তাও লজ্জাশীলতা ও শালীনতার পরিপন্থী।

৬. গালাগাল যে লোক দেয়, সে তার নিজেকে কষ্ট দেয়, কঠিনভাবে পীড়ন করে। যাকে দেয়, তাকেও সে পীড়িত করে। কাজেই মুসলিম ব্যক্তির গালাগাল দিয়ে না নিজেকে কষ্ট দেয়া উচিত, না অন্যদেরকে। এই কারণেই নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

المسلم من سلم المسلمين من لساله ريده- (مسلم- كتا الايمان)

প্রকৃত মুসলিম তো সেই ব্যক্তি, যে তার মুখের কথা ও হাতের কার্জ দ্বারা অন্যান্য মুসলিমদের কোন জ্বালা-যন্ত্রণা, কষ্ট দেয়নি।

মৃত্যুর পর

মৃত লোকদের সম্পর্কে খারাপ কথাবর্তা বলাও নিষিদ্ধ। কেননা তার জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের মনে আঘাত লাগে। আসলে গালাগাল দিয়ে নিজেকেই হীন প্রমাণিত করা হয়। অথচ নিজেকে হীন প্রমাণিত করার অধিকার কারোরই নেই। তাতে নিজের উপর নিজের হক্‌ নষ্ট হয়, নিজের প্রতি নিজের কর্তব্যের অবহেলা হয়।

গালাগাল দিতে অভ্যস্ত লোকেরা মানব সমাজের পারস্পরিকভাবে গালাগাল দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, মানব সমাজের বাইরে নিষ্প্রাণ ও বিবেক-বুদ্ধিহীন জীব-জন্তু ও ঘটনা-দুর্ঘটনাকেও গালাগাল দিয়ে থাকে—বিশেষ করে যখন তার থেকে মানুষ কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যেমন গরু-ছাগল যখন কারোর ক্ষেত নষ্ট করে, তখন সেই গরু-ছাগলের উপর গালাগাল থেকে মারপিট পর্যন্ত চালানো হয়। কালের ঘটনা-দুর্ঘটনা, ঝর-ঝঞ্ঝা, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসে যখন মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়, তখন সে এইগুলিকে গাল-মন্দ করতে থাকে। খোদ এগুলির যে কোন দোষ নেই, তা সে বুঝতে চায় না। এগুলির দরুন যদি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, তার মূলে সেই মানুষেরই আল্লাহ্‌দ্রোহিতামূলক অপরাধ রয়েছে, যার দরুন এসব প্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে অর্থাৎ সে দুর্ঘটনার পিছনে রয়েছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। এই কারণে ইসলাম এই সবকে গালাগাল দিতে

নিষেধ করেছে। নবী করীম (স) স্বয়ং আল্লাহ্‌র জবানীতে কথাটি এভাবে বলেছেনঃ

"আল্লাহ্‌ বলেন, মানুষ কাল ও সময়কে মন্দ বলে, অথচ আমি নিজেই হচ্ছি কাল ও সময় (অর্থাৎ এর স্রষ্টা), রাত-দিন তো আমার মুঠোর মধ্যে।"

(বুখারী, কিতাবুল আদব)

একবার বাতাস এক ব্যক্তির গায়ের চাদর এদিক-ওদিক করে দিল, উড়িয়ে নিল। লোকটা বাতাসের উপর অভিশাপ দিতে শুরু করল। শুনে রাসূলে করীম (স) বললেন, বাতাসকে মন্দ বলো না, অভিশাপ দিও না। কেননা বাতাস তো আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা মাত্র। (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব)। এক সফরকালে একটি মেয়েলোক তার উটটির উপর অভিশাপ দিল। নবী করীম (স) তার উট-টিকে আলাদা করে নিলেন। (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব) এটাই ছিল মেয়েলোকটির এই অবাঞ্ছিত কাজের শাস্তি, যেন সে আর কখনও উটকে অভিশাপ না দেয়।

কাউকে লক্ষ্য করে মুখে অশ্লীল ভাষায় কথাবার্তা উচ্চারণ করাই ইসলামের দৃষ্টিতে গাল-মন্দ নয়, কাউকে কথার দ্বারা অপমান করা বা কারোর মনে কষ্ট দেওয়াও ইসলামে গালাগাল পর্যায় এবং নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তিকে ফাসিক বা কাফির বলা যদিও প্রচলিত নিয়মে কোন গাল নয়, কিন্তু ইসলামে তা একটি বড় কঠিন গাল। নবী করীম (স) বলেছেন, কেউ যেন তার ভাইকে ফাসিক বা কাফির না বলে। কেননা সে যদি আসলে ফাসিক বা কাফির না হয়, তা'হলে এই গালটি একটি মিথ্যা খারাপ কাজের অভিযোগে তোহমাতে পরিণত হবে। আর সে তোহমত স্বয়ং আরোপকারীর উপরই লাগবে। বস্তুত এই ধরনের কাজ করে মানুষের নিজের উপর নিজের হক নষ্ট করে, নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য উপেক্ষা করে। তা এমন একটি কাজ, যা দ্বারা নিজেরও ক্ষতি করে, আবার অন্যদেরও। আর সেই ব্যক্তি যদি আসলেই ফাসিক ও কাফির হয়, তাহলে গাল দানকারী ব্যক্তি হয়ত ফাসিক ও কাফির হবে না, কিন্তু গুনাহ্‌গার অবশ্যই হবে। কেননা তা বলায় সে অপমানিত হয়। আর আল্লাহ্‌ প্রত্যেক ব্যক্তির মান-সম্মান মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। বিদায় হজের ভাষণে নবী করীম (স) মুসলমানদের এই শিক্ষা দিয়েছেনঃ 'আল্লাহ্‌ তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-মাল, তোমাদের ইয্‌যত-আবরু তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

মুনাফিকী, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ওয়াদা ভঙ্গ

দুইজন ব্যক্তির মধ্যে মত-পর্থক্য বা বিবাদ হলে এক ব্যক্তি আন্তরিকতা, নিষ্টা ও সততা সহকারে উভয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে পারে। তাতে সেই

ব্যক্তিকে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ উভয়ের বন্ধু সেজে একজনের কথা অপর জনের নিকট পৌঁছিয়ে উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে আরও অধিক খারাপ করার কোন অধিকার কারোর থাকতে পারে না। এ কাজ চরিত্রহীনতা ও চোগলখুরীর চাইতে অধিক খারাপ। কেননা চোগলখোর তো একজনের কথা অন্যজনের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয়। আর দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনকারী এই উপায়ে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়, শত্রুতার মাত্রা অনেকখানি তীব্র করে তোলে।

দ্বিমুখী নীতি গ্রহণকারী ব্যক্তি একজনের কথা অন্যজনের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না। সে একজনের সম্মুখে তার প্রশংসা করে, তার নিকট থেকে সরে গিয়ে তার দোষই বলতে শুরু করে। আর এটা মুনাফিকীর একটা বড় লক্ষণ। এ কারণে সাহাবাগণ এই দ্বিমুখী নীতিকে সুস্পষ্ট মুনাফিকী মনে করতেন। একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-কে বলা হল, আমরা শাসক ও রাজাদের নিকট গেলে এক ধরনের কথাবার্তা বলি আর তাদের নিকট থেকে বের হয়ে এসে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কথা বলি। একথা শুনে তিনি বললেনঃ রাসূলে করীম (স)-এর যুগে আমরা একে সুস্পষ্ট মুনাফিকী গণ্য করতাম। কুরআন মজীদে মুনাফিকী চরিত্রের যে রূপরেখা অংকিত হয়েছেঃ

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ - (البقره - ١٤)

ওরা যখন মু'মিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে আমরাও ঈমানদার হয়েছি। কিন্তু পরে তারা যখন তাদের শয়তানি নেতাদের একান্তে মিলিত হয় তখন তারা বলে আমরা তো আসলে আপনাদেরই সঙ্গে রয়েছি। (আর ওদের সঙ্গে দেখা করে যা বলি তাতে) আমরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করি মাত্র।

সামাজিকভাবে এই দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনকারীরা খুবই নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য চরিত্রের লোক। হাদীসে এই লোকদের সম্পর্কে অত্যন্ত কড়া কথা উচ্চারিত হয়েছে। একটি হাদীসের কথা এইরূপঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট তুমি সবচেয়ে বড় দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনকারীকে দেখতে পাবে, যার নীতিই ছিল এই যে, কিছু লোকের নিকট গিয়ে এক রূপ চেহারা প্রকাশ করে আর অপর কিছু লোকের নিকট গিয়ে অন্য রূপ চেহারা প্রকাশ করে। (বুখারী, কিতাবুল আদব)

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ দুনিয়ায় দ্বিমুখী ভূমিকা অবলম্বনকারী ব্যক্তির মুখে কিয়ামতের দিন আগুনের দুইটি জিহ্বা হবে। কথাটি এই দুনিয়ার অবস্থার প্রতি ইঙ্গিতকারী, তার প্রকৃত অভ্যাসের বাস্তব প্রকাশ।

এই মুনাফিকরাই করে বিশ্বাসঘাতকতা ও দাগাবাজি। তার অর্থ, কাউকে মুখের কথা দ্বারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত করে দেয়া এবং পরক্ষণেই—সুযোগ বুঝে তার বিরুদ্ধতা করা, মুখের কথার বিপরীত কাজ করা। কুরআন মজীদে এইরূপ করাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ এক অত্যন্ত নিকৃষ্ট চরিত্রের কাজ। আর এটাই ছিল তদানীন্তন যুগের কাফিরদের চরিত্র। তারা মুখে বারবার সন্ধি সমঝোতার ওয়াদা করত কিন্তু কার্যত তার বিপরীত করত, কুরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ- (الانفال - ٥٦)

বেঈমান কাফির হচ্ছে সেই সব লোক, যাদের সাথে-হে নবী, তুমি শান্তির চুক্তি কর, পরে তারাই তাদের ওয়াদাকে বারবার ভঙ্গ করে। আর আসল কথা হচ্ছে, ওদের মনে আল্লাহ্‌র ভয় মাত্রই নেই।

বস্তুত ওয়াদা করা, কারোর সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া এবং প্রতিবারই তা ভঙ্গ করা—এটা কুফরী কাজ। যাদের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান নেই, আল্লাহ্‌র এক বিন্দু ভয় নেই, তারাই এই কুফরী কাজ করতে পারে। আর যারাই এই কাজ করে তারা আল্লাহ্‌র রহমত ও মুহব্বত উভয় থেকেই বঞ্চিত থাকবে নিঃসন্দেহে। হাদীসে বলা হয়েছেঃ কিয়ামতের দিন এ সব বিশ্বাস ভঙ্গকারী একজন বিশ্বাসঘাতক রূপে চিহ্নিত করতে পারবে। (মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ আসমিয়র)

তাই বেঈমানী, বিশ্বাসঘাতকতা ও মুনাফিকী না করার জন্য ইসলামে কুরআনে ও হাদীসে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপদেশ দেয়া হয়েছে। তেমনি মানুষের পরস্পরের সাথেও করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এ কাজে যেমন আল্লাহ্‌র হক্ নষ্ট হয়, তেমনি অন্য মানুষেরও হক্ বিনষ্ট হয়; বিনষ্ট হয় নিজের উপর নিজের হক, নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য। এই কাজ করে নিজেকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত বানানোর এবং সমাজের লোকদের নিকট নিজেকে একজন বিশ্বাসঘাতক, চরিত্রহীন ও বেঈমান ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করায় নিজেকে অপমানিত লাঞ্ছিত করার কোন অধিকার কারোরই থাকতে পারে না।

এই কারণেই কুরআন ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে বলেছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ - (المائدة - ١)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা পারস্পরিক চুক্তিসমূহ অবশ্যই পূরণ করবে।

এই কারণেই নবী করীম (স) যখনই কোন সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণ করতেন, তখন সেনাপতিদের নসীহত করতেন, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। (মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, আসমিয়র)। অর্থাৎ শত্রু পক্ষের সাথে কোন চুক্তি করলে তা অবশ্যই রক্ষা করবে, চুক্তির শর্তাবলী যথাযথভাবে অবশ্যই পালন করবে। জালিম ও কাফির রাজা-বাদশাহ ও সরকারসমূহ প্রায়ই এইরূপ করে থাকে যে, শান্তি ও নিরাপত্তার ওয়াদা করে লোকদের ডেকে এনে তাদের জেলে আটক করে কিংবা হত্যা করে। এর মত মর্মান্তিক ও অমানবিক ঘটনা আর কিছুই হতে পারে না। শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই নয়, ব্যক্তিগত পর্যায়েও এ ধরনের বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনা সমাজে দিনরাত ঘটছে। রাসূলে করীম (স) বলেছেন, যদি কেউ জীবন-প্রাণের অভয় ও নিরাপত্তা দিয়ে কাউকে হত্যা করে, তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই, নিহত ব্যক্তি একজন কাফিরই হোক না-কেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ্, সহীহ্ ইবনে হাবস)

যেমন বলা তেমন কাজ না করা—অন্য কথায় বলা এক, করা তার বিপরীত, এই আচরণকে যেমন মুনাফিকী বলা যায়, তেমনি বলা যায় বিশ্বাসঘাতকতা, আর এটাই হচ্ছে ওয়াদা ভঙ্গ করার অপরাধ। এটা এক ধরনের মিথ্যাবাদও। প্রত্যেক ব্যক্তি ও জনসমষ্টির কর্তব্য হচ্ছে, মুখে যা বলবে কাজে তাই করবে। মুখে এক রকম বলা আর তার বিপরীত কাজ করা এক ধরনের মারাত্মক প্রতারণাও বটে।

বস্তুত কেউ যখন কোন কথা বলে তখন সে কথার বাস্তবতা প্রমাণ করা তার এক স্বাভাবিক কর্তব্য হয় দাঁড়ায়। যদি কেউ কোন কাজে ওয়াদা করে তখন সে ওয়াদা পূরণ করা—ওয়াদা মত কাজটি করা তার মানবিক দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'আলা আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছেনঃ

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً – (بنی اسرائیل - ٣٤ ؑ)

তোমরা অবশ্যই ওয়াদা পূরন করবে। কেননা ওয়াদার ব্যাপারে ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।

এ দুনিয়ার জীবনে ওয়াদা করে তা পূরণ না করলে রেহাই পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোন জওয়াবদিহি করতে হবে না, এমন কথা মনে করা মারাত্মক ভুল। দুনিয়ায় রেহাই পেয়ে গেলেও পরকালে যে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সর্বোপরি এই ব্যাপারটি একটি মস্তবড় মুনাফিকীও বটে। মুনাফিকদের মারাত্মক চরিত্র হচ্ছে, তারা ওয়াদা করে পূরণ করে না। ওয়াদা

করে তা পূরণ না করা অতি বড় মুনাফিকী। এই দিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ওরা আল্লাহ্‌র নিকট ওয়াদা করেছিল, আল্লাহ্‌ যদি অনুগ্রহ করে নবী প্রেরণ করেন, তাহলে তারা অবশ্যই সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং তার প্রতি ঈমান এনে নেক্‌কার ঈমানদারের জীবন যাপন শুরু করবে। কিন্তু বাস্তবিকই যখন তাদের নিকট আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এসে পৌঁছালো, তখন তারা তাকে সত্য বলে মেনে নিতে কার্পণ্য করতে লাগল এবং ওয়াদা থেকে ফিরে গেল।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ - (التوبه - ٧٧)

ফল এই হল যে, তাদের এই ওয়াদা—যা তারা আল্লাহ্‌র সাথে করেছিল—ভঙ্গের কারণে এবং এই মিথ্যার কারণে—যা বলতে তারা অভ্যস্ত হয়েছিল—আল্লাহ্‌ তাদের দিলে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন। আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের (কিয়ামতের) দিন পর্যন্ত তারা এই মুনাফিকীতেই ডুবে থাকবে।

রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন, মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ স্পষ্ট। যখন কথা বলবে, মিথ্যা বলবে, যখন ওয়াদা করবে, ওয়াদা ভঙ্গ করবে এবং যখন আমানত রক্ষী হবে তখন তাতে খিয়ানত করবে (বুখারী, মুসলিম)। যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলিমও মনে করে, তবুও সে মুনাফিক। (মুসলিম)

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'যার মধ্যে চারটি গুণ থাকবে, সে পাক্কা মুনাফিক।' আর যার মধ্যে এর কোন একটি পরিলক্ষিত হবে, তার মধ্যে মুনাফিকের একটা লক্ষণ অবশ্যই থাকবে, যতক্ষণ সে তা ত্যাগ না করবে। তাহলঃ যখন তার নিকট কিছু আমানত রাখা হবে, সে খিয়ানত করবে, যখন কিছু বলবে, মিথ্যা বলবে, যখন ওয়াদা বা চুক্তি করবে, তার বিরুদ্ধতা করবে এবং যখন ঝগড়া করবে, তখন সে গালাগাল করবে। (মুনযিরী, তারগীব ও তারহীম)

রাসূলে করীম (স) একবার বলেছিলেনঃ "তোমরা আমার নিকট থেকে তিনটি কাজের দায়িত্ব গ্রহণ কর, তা হলে আমি তোমাদের জন্য তিনটি কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবঃ যখন কথা বলবে, সত্য বলবে; যখন ওয়াদা করবে, তা পূরণ করবে, আর যখন কোন কিছুর আমানতদার হবে, তখন তাতে খিয়ানত করবে না।" (মুসনাদে আহমদ, হাকেম, আবূ ইয়ালা, বায়হাকী, মুনযিরী)

বস্তুত আমানতে খিয়ানত একটা বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা, একটা ওয়াদা খেলাফী, একটা প্রতারণা এবং এসব মিলে একটা মুনাফিকী। কারোর নিকট কোন জিনিস আমানত রাখা হলে তা নষ্ট করা—ফেরত চাইলে ফেরত না দেয়াকেই খিয়ানত করা বলা হয়। আমানতের জিনিস নিজে ব্যবহার করাও খিয়ানত। কেননা সেটির সংরক্ষণের জন্যই তার নিকট রাখা হয়েছে, এখন সে নিজেই যদি তা সে জিনিসের মালিকের অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করে, তাহলে সে জিনিসটি সংরক্ষিত হলো না, যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার নিকট তা রাখা হয়েছিল, সে বিশ্বাসটাই ভঙ্গ করা হল।

কেউ যদি কোন গোপন কথা কারোর নিকট বলে এবং বলে যে, এই কথাটি তোমার নিকট আমানত, কাউক বলবে না, তখন সে কথাটি অন্যকে বলে দেয়াও আমানতের খিয়ানত। এতেও বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। তাই এই উভয় কাজই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

একটি কাজের দায়িত্ব কারোর উপর অর্পিত হলে এবং সে কাজটা সেই করবে বলে ওয়াদা করলে সেটিও একটি আমানতের কাজ হয়। তাই সেই কাজটি না করলে তা আমানতের খিয়ানত হবে। একটি মেয়ে বিবাহিতা হয়ে পিতার ঘর ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে যায় এবং নিজের সব কিছু স্বামীর নিকট সপে দেয়, সেটিও একটি আমানতের ব্যাপার হয়। এমনিভাবে একজন পুরুষ যখন একটি মেয়েকে বিবাহ করে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে, তখন স্বামীর সব কিছুই স্ত্রীর নিকট আমানত হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ হওয়া সুস্পষ্ট খিয়ানত। কাজটি যত বড় ও যত গুরুত্বপূর্ণ তাতে বিশ্বাস ভঙ্গ হলে তা তত বড় খিয়ানত—তত বড় বিশ্বাস ভঙ্গ এবং তত বড় গুনাহ্ হয়। কোন নেতা যখন কোন কাজের ওয়াদা করে কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করে নেতৃত্ব বা শাসনের ক্ষমতা লাভ করে, তখন সে যদি ওয়াদা মত কাজ না করে, তাহলে সেটিও আমানতের খিয়ানত। ইসলামে এই সব খিয়ানত-ই একসাথে ও সমানভাবে নিষিদ্ধ। এইজন্য আল্লাহ্ বলেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ – (الا نفال – ٢٧)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা খেলাফীর কাজ করো না, বিশ্বাস ভঙ্গ করো না তোমাদের পারস্পরিক আমানতসমূহে জেনে শুনে।

আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে খিয়ানত হচ্ছে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে করা ওয়াদা মত কাজ না করা, আদেশ-নিষেধ অমান্য করা, তাঁর দ্বীনের হিফাজত না করা, দ্বীন অনুযায়ী কাজ না করা, জনগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা। রাসূলে করীম (স) নিজে এই খিয়ানত থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চেয়েছেন। বলেছেনঃ "হে আল্লাহ্, আমাকে খিয়ানত করা থেকে রক্ষা কর। কেননা এটি একটি অত্যন্ত খারাপ অভ্যন্তরীণ সঙ্গী।" (বুখারী, মুসলিম)

কোন পরিবারের সদস্য হয়ে সেই পরিবারের আর্থিক বা নৈতিক ক্ষতি সাধন করা, কোন দল বা সমাজভুক্ত হয়ে সেই দল বা সমাজের মূলোৎপাটনের জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে কাজ করা খিয়ানত। কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পদে নিযুক্ত হয়ে, তার নিকট থেকে রীতিমত বেতন ভাতা গ্রহণ করতে থাকা ও সেই সাথে ঘুষ লওয়া, যথার্থ কাজ না করে বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ করাও অতি বড় খিয়ানত—একটি বড় বিশ্বাসভঙ্গের কাজ। মনে মনে ও গোপনে বিদেশী শক্তির দালাল হয়ে মুখে জনগণকে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দিয়ে গোটা জাতিকে বিদেশী শক্তির নিকট গোলামে পরিণত করাও একটি অতিবড় বিশ্বাসঘাতকতা। মদীনার মুনাফিকরা তাই করত, তারা মুখে ঈমান এনেছি বলে ঈমানদারদের সমাজে শমিল হয়ে প্রকৃতপক্ষে তার ক্ষতি করত, মক্কার কাফিদের সাথে গোপন যোগসাজশে লিপ্ত হয়ে মুসলমানদের বিশ্বাস ভঙ্গ করতে থাকত। নিরন্তর। কুরআনে তাই বলা হয়েছেঃ

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ - (المائدة - ١٣)

তুমি প্রায়ই তাদের কোন-না-কোন বিশ্বাস ভঙ্গের খবর জানতেই থাকবে।

হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রীরা নিজ নিজ স্বামীর সাথে এই বিশ্বাসভঙ্গেরই কাজ করেছিল। এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا - (التحريم - ١٠)

সেই দুজন স্ত্রীলোক আমাদের দুইজন নেক বান্দার বিবাহিতা ছিল। কিন্তু পরে তারা দু'জনই নিজ নিজ স্বামীর সাথে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করে (দ্বীন ইসলামের প্রতি ঈমান আনে না, কুফুরী করে) কিন্তু সে দু'জন (নবী হয়েও) আল্লাহ্র আযাব থেকে তাদেরকে এক বিন্দু রক্ষা করতে পারেনি।

এই খিয়ানত যেমন কাজে হয়, তেমনি মনে ও ঈমানে হয়। একটি অঙ্গ দ্বারাও তা হতে পারে। চক্ষু ও দিলের খিয়ানতের কথা এ আয়াতটিতে বলা হয়েছেঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ - (المؤمن - ١٩)

আল্লাহ্ চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা জানেন, জানেন মনের গভীরের লুক্কায়িত কথাও।

বস্তুত এই মুনাফিকী, এই বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা ভঙ্গের কাজ প্রথমত আল্লাহ্‌র হক্ নষ্টকারী, দ্বিতীয়ত নিজের হক্ নষ্টকারী এবং তৃতীয়ত সমাজের লোকদের হক্ বিনষ্টকারী। এই কাজ থেকে বিরত না হলে হক্ নষ্ট করার এই তিনটি দিক দিয়েই মহা অপরাধী হতে হবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

চোগলখুরী, গীবত ও খারাপ ধারণা পোষণ

চোগলখুরী

'চোগলখুরী' কথাটা ফারসী শব্দ। বাংলায় 'কুটনাগিরি' বলা হয়। সত্য মিথ্যা কথা বলে দু'জন লোকের মধ্যে পারস্পরিক খারাপ ধারণার সৃষ্টি, একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং উভয়ের উপর নিজের বাহাদুরী জাহির করাই হল কুটনাগিরির কাজ। এই কাজ যে করে সে ঘুরেফিরে একজনের নামে অপরজনের নিকট এমন এমন কথা বলে যাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে, তাকে পরম শত্রু মনে করতে থাকে। এই কারণে তাদের কথার কোন মূল্য দেয়া উচিত নয়, সেই লোকদের পরিচিতি হিসেবে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ - (القلم - ١١)

যারা কুটনাগিরি করে বেড়ায়........

এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এই নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, যার তার কথা শুনা উচিত নয়; কেউ এসে যে কোন ধরনের একটা খবর দিলে অমনি তা বিশ্বাস করে নেয়া উচিত নয়। বরং তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করা একান্ত আবশ্যক। তারপরই সে কথাকে সত্য বলে মেনে নেয়া কিংবা অসত্য বলে উড়িয়ে দেয়ার প্রশ্ন আসে। বিশেষ করে কথাটা যে বলেছে—খবরটা যে দিয়েছে, সে কোন্ চরিত্রের, স্বভাবের, মন-মানসিকতার লোক, তা অবশ্যই ভালভাবে

যাচাই করা আবশ্যক। কেননা কারোর কথা বিশ্বাস করে নিয়ে তাড়াহুড়া করে কোন পদক্ষেপ নিয়ে বসলে তার পরিণাম ভাল না-ও হতে পারে, পরে আফসোসও করতে হতে পারে। আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ - (الحجرت - ٦)

হে ঈমানদার লোকেরা! কোন ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোন খবর লয়ে আসে, তা হলে তোমরা তার সত্য-মিথ্যা অবশ্যই যাচাই করবে, যেন তার কথা শুনে-ই অজ্ঞতাবশত কোন জনগোষ্ঠীর উপর ঝাঁপিয়ে না পড়, তাহলে শেষে তোমরা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে পড়বে।

এ আয়াতে মিথ্যা সংবাদ রচনাকারীকে আল্লাহ্‌ ফাসিক বলেছেন। 'ফাসিক' অর্থ শরীয়াত অমান্যকারী ব্যক্তি। যে আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম পালন করে না, সেই ফাসিক। আয়াত অনুযায়ী এরূপ ব্যক্তির কোন কথা, কোন দেয়া সংবাদ সহসাই বিশ্বাস করা যায় না, তা উচিতও নয়। হাদীসে এই চোগলখুরী পর্যায়ে অত্যন্ত কড়া কড়া কথা এসেছে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন, সবচেয়ে খারাপ লোক কারা তা কি আমি তোমাদের বলব? পরে নিজেই বললেনঃ

المشاون با نميمة المفسدون بين الاحبة -

যে লোকেরা চোগলখুরী করে বেড়ায়, যারা বন্ধুদের পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা ও শত্রুতার সৃষ্টি করে, বিভেদ ও বিদ্বেষ ছড়ায়। (মুসনদে আহমদ)

নবী করীম (স) একটি কবরস্থানের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করা কালে বললেনঃ "এই কবরস্থানে শায়িতদের মধ্যে একজনের আযাব হচ্ছে শুধু এইজন্য যে, সে কুটনাগিরি করে বেড়াত।" (বুখারী, মুসলিম)

الا انبئكم ما العضة هى النميمة القالة بين الناس -

'উদ্দা' বলতে কাকে বোঝায়, আমি তা তোমাদের বলব কি? তা হচ্ছে চোগলখুরী, লোকদের পরস্পরের মধ্যে (সম্পর্ক ছিন্নকারী) কথা ছড়ানো। (মুসলিম)

যারা এই ঘৃণ্য কাজ করে, তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে, নিজেদের সাথেই শত্রুতা করে নিজেদের লাঞ্ছিত অপমানিত করার মাধ্যমে। عضة শব্দের

আভিধানিক অর্থ বিভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটানো বা যাদু করা। উদ্ধৃত হাদীসে তার অর্থ, বিভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটানো। তাই দুই ব্যক্তির পরস্পরের কথা বলে সম্পর্ক খারাপ করা, দুজনকে দুজনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করাই হচ্ছে চোগলখুরী। আর 'যাদু' অর্থ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যাদুর দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটানো। এটা পরিবারিক জীবনের জন্য খুবই মারাত্মক। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ (البقره - ١٠٢)

ওরা যে দু'জনার নিকট থেকে সেই বিদ্যা শিখে, যদ্দারা তারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়।

সাধারণভাবে তাফ্‌সীর লেখকগণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদকারী বিদ্যা হিসেবে 'যাদু'র কথাই বলেছেন। এই কাজটিও অত্যন্ত গর্হিত। এজন্যই রাসূলে করীম (স) বলেছিলেনঃ

لا يبلغنى احد من اصحابى عن احد شيا ء فانى احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر -

তোমরা এক সাহাবী অপর এক সাহাবীর বিরুদ্ধে আমার নিকট কেউ কিছু বলবে না। কেননা আমি তোমাদের সম্মুখে পরিচ্ছন্ন দিল নিয়ে উপস্থিত হতে চাই—এটাই আমার পছন্দ। (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব)

কোন কোন তাফসীর লেখকের মতে আবূ লাহাবের স্ত্রীকে 'কাষ্ঠ বহনকারিণী' বলা হয়েছে রূপক ভাষায়। কেননা আসলে সে একজনের সাথে আর একজনের ঝগড়া লাগাইবার ভয়ানক বদ-অভ্যাসের মেয়েলোক ছিল।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন 'চোগলখোর কখনই জান্নাতে যাবে না।' (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব)

চোগলখুরীর হনি কাজটি সাধারণত মুখে মুখেই করা হয়। কিন্তু আসলে অনেক সময় তা ইশারা ইঙ্গিতেও লেখার মাধ্যমেও করা হয়ে থাকে। তাই লোকদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টিকারী লেখাও এই নিষিদ্ধ কাজের আওতার মধ্যে পড়ে।

মূলত এটি ব্যক্তির হীন মন-মানসিকতা ও কুৎসিৎ চরিত্রের লক্ষণ। যে সমাজে এই কাজের ব্যাপকতা, সে সমাজ সুস্থ সমাজ বিবেচিত হতে পারে না। এ একটা মারাত্মক রোগ, যে সমাজদেহে এই রোগের প্রকোপ সেই সমাজ ভদ্র, সুস্থ, ঈমানদার মানুষের বাসোপযোগী হতে পারে না। এসব কাজ যারা করে

তারা সাধারণত এ কাজকে তেমন দোষের মনে করে না। কিন্তু আসলে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। বুখারী শরীফে উদ্ধৃত অপর এক দীর্ঘ হাদীসে চোগলখুরীকে কবর আযাবের একটা বড় কারণ রূপে দেখানো হয়েছে। (বুখারী, কিতাবুল আদব)

কুরআন মজীদের সূরা আল-কালামের ১০, ১১, ১২ এই তিনটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ - هَمَّازٍ مَّشَّاءٍۭ بِنَمِيمٍ - مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ - (القلم -١٢-١١-١٠)

তুমি এমন কোন লোকেরই কথা মত কাজ করবে না, যে খুব কিরা কসম করে কথা বলে, নির্লজ্জ স্বভাবের কুটনাগিরি করে বেড়ায়, কল্যাণময় কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখে, সে সীমালংঘনকারী, মহাপাপী।

এ আয়াত কয়টিতে যে যে খারাপ চরিত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে মারাত্মক। আর এগুলি যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হয়, তাহলে তো সে কতটা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে তা বলার প্রয়োজন পড়ে না। এই স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা প্রতিটি খারাপ চরিত্রের সাথে অপর প্রত্যেকটির গভীর সম্পর্ক অনস্বীকার্য।

বস্তুত এই অপরাধসমূহ একত্রিত হোক কিংবা প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবেই লোকদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠুক, তা থেকে প্রত্যেকটি ঈমানদার ব্যক্তিকে অবশ্যই মুক্ত ও পবিত্র হতে হবে। কেননা একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এর প্রত্যেকটি অপরাধই ব্যক্তির নিজের উপর নিজের হক্ বিনষ্টকারী, ব্যক্তির উপর অপর লোকের হক্ নষ্টকারী এবং সর্বোপরি ব্যক্তির উপর আল্লাহ্র হক্ বিনষ্টকারী।

গীবত

মানুষের মান-সম্মান যথাযথভাবে রক্ষা পাওয়া ইসলামী শরীয়াতের একটি প্রধান লক্ষ্য। আর সে জন্য সমাজের লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ভাল, হৃদ্যতাপূর্ণ ও আন্তরিক থাকা একান্তই প্রয়োজন। কাজেই যে সব চরিত্রহীন কাজে পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয়, সেগুলি শরীয়াতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই পর্যায়ে চোগলখুরীর কথা উপরে বলা হয়েছে। এখানে গীবতের কথা বলা হচ্ছে। গীবত ঐ ধরনেরই একটা অতিশয় মারাত্মক গুনাহ।

কেবল চোগলখুরী ও গীবতই নয়, পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপকারী ও সমাজকে হিংসা-বিদ্বেষ ও ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী সব কয়টি কাজের কথা আল্লাহ্ তা'আলা একটি স্থানে বলে দিয়েছেন এ আয়াতের মাধ্যমেঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ - (الحجرت-١٢-١١)

হে ঈমানদার লোকেরা! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে সে এর তুলনায় উত্তম লোক, আর কোন স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোককে ঠাট্টা করবে না, কেননা হতে পারে সে এর তুলনায় অনেক ভাল। নিজেদের মধ্যে একজন আর একজনের উপর দোষারোপ করবে না, না একজন অপর লোকদের খারাপ উপমায় স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসিকী কাজে খ্যাতিলাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যে সব লোক এই হীন আচার-আচরণ থেকে বিরত না থাকবে তারাই জালিম। হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশী বেশী ধারণা ও সন্দেহ সংশয় পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা কোন কোন খারাপ ধারণা বড় গুনাহের কাজ হয়ে পড়তে পারে। তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় খোঁজা-খুঁজি করবে না। আর তোমাদের কেউ যেন অপর কারোর গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাই তো এই কাজকে ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্ তো খুব বেশী বেশী তওবা গ্রহণকারী, অতীব দয়াবান।

কুরআন মজীদের এ নৈতিক আদর্শসমূহের উল্লেখ এক সাথে করে দেয়ায় এর গুরুত্বই অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মানুষের একবিন্দু অপমান, মানুষের প্রতি অকারণ খারাপ ধারণা পোষণ এবং কারোর

দোষের ব্যাপক চর্চা হওয়া ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গীবত এই পর্যায়ের দোষসমূহের মধ্যে খুব বেশী মারাত্মক—তা আল্লাহ্‌র কথার ধরন দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। গীবত হচ্ছে এক ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দোষ অন্যদের নিকট প্রকাশ করা। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে রাসূল! সে দোষ যদি সেই ব্যক্তির মধ্যে আসলেও থাকে, তাহলেও কি তা বলা গীবত হবে? রাসূলে করীম (স) বললেনঃ হ্যাঁ, সে দোষ তার মধ্যে থাকলেও তা বলা গীবত হবে। আর যদি তা তার মধ্যে না-ই থাকে তাহলে তো তা বলা বুহতান—'মিথ্যা দোষারোপ' হবে।

(আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব)

উদ্ধৃত আয়াতে 'গীবত' করাকে 'মৃত ভাই'র গোশত খাওয়ার মত কাজ বলা হয়েছে এবং এটা স্বাভাবিকভাবেই সব মানুষের নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। মানুষের সৃষ্টিগত সম্মান ও মর্যাদার কারণেই তার গোশ্‌ত খাওয়া হারাম। কাজেই তার সম্মান ও মর্যাদার হানিকর যে কোন কাজ হারাম হবে। এটাই তো স্বাভাবিক। উপস্থিত বিবদমান দুই পক্ষের লোকের পরস্পরের দেহের গোশ্‌ত ছিঁড়ে নিতে পারে—এটা খারাপ কাজ হলেও এতে এক প্রকারের বীরত্বের লক্ষণ থাকে। কিন্তু কোন মৃত ব্যক্তির গোশ্‌ত ছিঁড়ে নিলে তা খারাপ কাজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুবই কাপুরুষতার লক্ষণ। কেননা যার গোশ্‌ত ছিঁড়ে নেয়া হচ্ছে, সে তো মৃত, সে তো নিজেকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতাই রাখে না। অনুরূপভাবে সামনা সামনি কেউ কাউকে খারাপ বলার মধ্যেও তা যদি অপছন্দনীয় হয় তাতে এক প্রকারের সাহসিকতা ও স্পষ্টবাদিতা দেখা যায়। কিন্তু কারোর অনুপস্থিতিতে তার দোষ বলা হলে সে তো তার প্রতিবাদ করতে বা স্বীয় নির্দোষিতা প্রমাণ করার সুযোগ পেতে পারে না। ফলে 'গীবত' বহুগুণ খারাপ ও নিকৃষ্ট অপরাধ হয়ে দাঁড়ায় স্বাভাবিকভাবেই। ভালবাসার আতিশয্যে মৃত ভাইর লাশ দেখাও অনেকের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে উঠে কিন্তু তাঁর গোশ্‌ত ছিঁড়ে খাওয়া কঠিন নির্মমতা ও পাষাণাত্মার লক্ষণ। তাতে পাশবিক হিংস্রতা তীব্র হয়ে উঠে।

মানুষ যখন নিজের জীবন রক্ষার জন্য হালাল খাদ্য পায় না, নিরুপায় হয়ে মুরদার গোশ্‌ত খেতে বাধ্য হয়, তখন তার এই কাজটির তাৎক্ষণিক অনুমতি আছে বটে; কিন্তু তখনও মানুষের লাশের পরিবর্তে অন্য কোন মরা জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়াকেই অগ্রাধিকার দিবে বলে মনে করা যায়। তাই কোন শরীয়াতী, সামাজিক, নৈতিক বা রাজনৈতিক কারণ না থাকলে কারোর অনুপস্থিতিতে তার গীবত করা জায়েয হতে পারে না।

অতএব গীবতের ন্যায় একটি কঠিন অপরাধের কাজ কোন মুসলিম ব্যক্তি করবে—তা কল্পনাও করা যায় না। এই কাজটি যে একাধারে নিজের উপর

নিজের, নিজের উপর আল্লাহ্‌র এবং নিজের উপর অপর ভাইর হক চরমভাবে বিনষ্টকারী—তা এ বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

প্রসঙ্গতঃ একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, গীবত সম্পূর্ণ হারাম হওয়া সত্ত্বেও জালিমের জুলুমের বিবরণ সাধারণ্যে প্রচার করার অনুমতি স্বয়ং আল্লাহ্‌ই দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

لَايُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ الَّامَنْ ظُلِمَ – (النساء - ١٤٨)

আল্লাহ্ কারোর বিরুদ্ধে খারাপ কথা প্রকাশ হওয়া আদৌ পছন্দ করেন না। তবে যার উপর জুলুম হয়েছে সে এই নিষেধের বাইরে।

অর্থাৎ জারিমের জুলুমের প্রতিবাদ করা আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ নয়। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্ তা পছন্দ করেন। কেননা কোন শক্তিমান দুর্বলের উপর অত্যাচার চালাবে, আর সে তা মুখ বুজে সইবে—আল্লাহ্ আদৌ পছন্দ করতে পারেন না। নবী করীম (স) বলেছেন; যার হক নষ্ট হচ্ছে তার প্রতিবাদ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এই জুলুম ও হক বিনষ্টকরণ ব্যক্তিগতভাবে হতে পারে, হতে পারে সমষ্টিগত ও জাতিগতভাবেও। তাই তার প্রতিরোধ করা ব্যক্তিগতভাবেই যেমন কর্তব্য, তেমনি জাতিগতভাবেও।

খারাপ ধারণা

এই গীবতের ন্যায় আর একটি মারাত্মক দোষ হচ্ছে, অন্য লোকদের সম্পর্কে মনে খারাপ ধারণা পোষণ। এ খারাপ ধারণা অনেকটা কাল্পনিক এবং ভিত্তিহীন। কারোর সম্পর্কে যখন মনে খারাপ ধারণা দানা বেঁধে উঠে ও পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, তখন সেই লোকটির কোন কাজকেই সে পছন্দ করতে পারে না। সে মনে করে, লোকটির একটা খারাপ মতলব আছে, যদিও তার কোন যুক্তি নেই, কোন ভিত্তি নেই। শুধু শুধু কারোর সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করাকে উপরোদ্ধৃত আয়াতে বড় গুনাহ্ বলা হয়েছে।

নবী করীম (স)-ও লোকদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা নিজেদের মনে পোষণ না করতে বলেছেন। কেননা মনের গোপন গহনে কারোর সম্পর্ক খারাপ ধারণা পোষণ সুস্থ সমাজ পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বলেছেনঃ তোমরা কারোর সম্পর্কেই নিজ থেকে খারাপ ধারণা মনে স্থান দেবে না। কেননা তা একটা অতিবড় মিথ্যা। তোমরা অপরের দোষ খুঁজে বেড়িও না। একজন অপরজনকে পিছনে ফেলে অগ্রে যাওয়ার কারণ কখনো মনে স্থান দেবে না। পরস্পর হিংসা ও

বিদ্বেষও পোষণ করো না। পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না হে আল্লাহ্‌র বান্দারা। যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ "তোমরা পরস্পরের ভাই হয়ে থাক।" (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

যে লোক (বা লোকেরা) এই সব হীন ও গুনাহের কাজ করবে, সে এক সাথে নিজের হক নষ্ট করে নিজের উপর জুলুমকারী হবে, আল্লাহ্‌র হক্‌ বিনষ্টকারী হবে, আল্লাহ্‌র নিষেধ অমান্যকারী হবে এবং অন্যান্য লোকদের হক্‌ হরণকারী হবে। কেননা তার প্রতি অন্যান্য ভাইদের হক্‌ ছিল যে, সে তাদের কোনরূপ ক্ষতি করবে না, তাদের প্রতি খারাপ ধারণা অমূলকভাবে পোষণ করবে না এবং তাদের সাথে কোন ভাবেই অকারণ শত্রুতা করবে না। অথচ এই অপরাধগুলি করে একই সাথে সে এতগুলি হক্‌ নষ্ট করেছে।

সবচাইতে বড় কথা, নিজে আল্লাহ্‌ সৃষ্ট সম্মানার্হ বান্দা হয়েও সে এসব নিকৃষ্ট কাজ করে। নিজেকেই সে সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছে, নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে দুনিয়ার জীবনে সামাজিকভাবে, এটা তার নিজের হক্‌ নষ্টকারী অতি বড় অপরাধ। এই অপরাধ করার তার কোন অধিকারই ছিল না।

দ্বিমুখী নীতি

যে সব কাজ করে মানুষ নিজেকে অপমানিত করে এবং তার ফলে নিজের হক্‌ নিজেই বিনষ্ট করে, নিজের উপর নিজেই জুলুম করে, দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ তার মধ্যে একটি। মূলত দ্বিমুখী নীতি খুব অবাঞ্ছিত ও মন্দ স্বভাব সৃষ্টিকারী প্রবণতা। দু'জনার মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্য হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে উভয়ই পারস্পরিক ভাল সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে পারে। কিন্তু এ ধরনের সম্পর্ক রক্ষায় দ্বিমুখী নীতির প্রশ্রয় দেয়া কিছুতেই উচিত হতে পারে না। এক্ষেত্রে দ্বিমুখী নীতির রূপ এই হতে পারে যে, উভয়ের বন্ধু সেজে একজনের কথা অন্যজনের নিকট পৌঁছিয়ে উভয়ের মধ্যের সম্পর্ক অধিকতর তিক্ত ও খারাপ করে তোলা। এটা একটা কঠিন চরিত্রহীনতাও বটে এবং তা চোগলখুরী অপেক্ষাও অনেক বেশী কঠিন। কেননা চোগলখুরী হচ্ছে শুধু একজনের কথা অন্যজনের নিকট পৌঁছানো। আর দ্বিমুখী নীতি হচ্ছে উভয়ের কথা উভয়ের নিকট পৌঁছানো।

দ্বিমুখী নীতিতে একজনের কথা অন্যজনের নিকট শুধু পৌঁছানোই জরুরী নয়, যদি কেউ কারোর সামনে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার প্রশংসা করে আর নিকট থেকে চলে যাওয়ার পরই তার দোষগুলির কথা বলে, তা হলেও সে দ্বিমুখী নীতির অনুসারীতে পরিণত হবে। অন্যদিক দিয়ে বলতে গেলে এটা একটা

মুনাফিকির চরিত্রও। সাহাবায়ে কিরাম এই নীতিকেও মুনাফিকী মনে করতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-কে বলা হল, আমরা শাসক-প্রশাসক ও আমীর-উমরাহদের নিকট গেলে এক ধরনের কথা বলি; কিন্তু তাদের নিকট থেকে উঠে চলে যাওয়ার পর অন্য ধরনের কথা বলি, এ সম্পর্কে আপনার মত কি? জবাবে তিনি বললেনঃ রাসূলে করীম (স)-এর সময় আমরা এরূপ করাকে নিফাক বা মুনাফিকী বলতাম। (বুখারী)

কুরআন মজীদে এই দ্বিমুখী নীতির নিফাককে এভাবে উন্মুক্ত করে ধরা হয়েছেঃ

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ - (البقره - ١٤)

ওরা যখন ঈমানদার লোকের সাথে সাক্ষাত করে, তখন বলে; আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু পরে যখন তারাই তাদের শয়তান নেতাদের নিকট একত্রে মিলিত হয়, তখন বলে, ওদের সাথে তো আমরা শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি।

বস্তুত দ্বিমুখী নীতি একজন ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের পরিচায়ক। আর সমাজ সমষ্টির দৃষ্টিতে কঠিন দুর্বলতার প্রমাণ। এরূপ সমাজ অন্তঃসারশূন্য এবং আত্মশক্তিহীন, দুর্বল ও বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। কঠিন আঘাত এলে এ সমাজ মুহূর্তে চুরমার হয়ে যাবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। আর যে ব্যক্তি এই নীতি গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত হীন মন-মানসিকতার ধারক হয়। সে যখন ধরা পড়ে, তখন আপন বন্ধুদের দ্বারাই ধিকৃত, তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত অপমানিত হতে বাধ্য হয়।

কিন্তু নিজেকে এইরূপ অবস্থায় ফেলে লাঞ্ছিত-অপমানিত হতে দেয়ার কোন অধিকার কোন ব্যক্তিরই থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি এরূপ করে সে কেবল দুনিয়ার শাস্তি পেয়েই রেহাই পায় না, পরকালেও তাকে কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। এই চরিত্রের লোকদের প্রতি হাদীসে হুমকি উদ্ধৃত হয়েছে। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন দ্বিমুখী নীতির অনুসারীকে আল্লাহ্‌র নিকট বড় অপরাধীরূপে দেখতে পাবে। যারা কিছু লোকের নিকট এক ধরনের রূপ গ্রহণ করে, আবার যখন অন্যদের নিকট যায়, তখন তাদের রূপ ভিন্ন রকমের হয়। অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় যেই লোক দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করবে কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের দুইটি জিহ্বা হবে (বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা) এ অবস্থা ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্রের প্রকৃত রূপকে তুলে ধরেছে। এ হেন ব্যক্তি সমাজে খুবই লাঞ্ছিত হয়েই জীবিত থাকতে পারে। পথে-ঘাটে

তাকে তুচ্ছতা ও অবহেলার সম্মুখীন হতে হবে এবং কিয়ামতের দিন নিক্ষিপ্ত হতে হবে কঠিন আযাবে।

কিন্তু কোন মানুষেরই অধিকার থাকতে পারে না নিজেকে এইরূপ অবস্থার মধ্যে ফেলার। সেও একজন মানুষ, তার নিজের প্রতি তার একটা কর্তব্য আছে, আছে নিজের উপর নিজের হক্। প্রত্যেকটি মানুষেরই কর্তব্য নিজেকে সর্বপ্রকার দুরবস্থা ও উপেক্ষা-অবহেলা, লাঞ্ছনা-অপমান থেকে রক্ষা করা। কিন্তু দ্বিমুখী নীতির এ চরিত্র গ্রহণ করা হলে তা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

কার্পণ্য

নিজের উপর ধার্য নিজের হক্ বিনষ্টকরণ অন্য কথায় নিজের উপর নিজেরই জুলুমকরণের একটা বড় দিক হচ্ছে কার্পণ্য। শুধু তা-ই নয়, তা চরিত্রহীনতার শিরোমণি ও বহু প্রকারের চরিত্রহীনতার মূল হচ্ছে এই কার্পণ্য। বিশ্বাসঘাতকতা, আমানতের খিয়ানত, লোভ-লালসা, দৃষ্টির সংকীর্ণতা ও সাহসহীনতা প্রভৃতি ধরনের অসংখ্য প্রকারের খারাপ চরিত্র মানুষের মধ্যে দেখা দেয় এই কার্পণ্যের কারণে। বলা যায়, এই একটি শিকড় থেকে বের হয়ে আসে অসংখ্য শাখা প্রশাখা। দ্বীন-ইসলাম মিথ্যা কথা বলার পর সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে এই শিকড়ের উপর। অন্নহীনকে অন্নদান, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়া, বস্ত্রহীনকে পোশাক দেয়া, ইয়াতীমকে আশ্রয় ও সহায়তা দান ও ঋণগ্রস্তকে আর্থিক সাহায্য দান মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে। এইসব কর্তব্য পালনে একটা স্থায়ী উপায় হিসেবে যাকাত ফরয হয়েছে। ইসলামে তো নামাযের পর যাকাত দ্বিতীয় গুরুত্ব পেয়েছে। রাসূলে করীম (স)-এর নিকট সর্বপ্রথম হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন হলে তিনি যখন কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন তখন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) তাঁকে কিছু কথা বলে সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন।

হে রাসূল! আপনার ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনি তো নিকটাত্মীদের হক্ আদায় করে থাকেন। ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায় করে দেন। দরিদ্রদের মূলধন দিয়ে সাহায্য করেন, মেহমানদারী করেন, সত্য দ্বীনের জন্য যারা বিপদগ্রস্ত হয়, তাদের সহায়তায় হস্ত প্রসারিত করেন। আপনি কোন বিপদের আশংকা বোধ করবেন কেন? (বুখারী)

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত ও রিসালাত লাভ করার পূর্ব থেকেই স্বাভাবিকভাবে তাঁর মধ্যে এইসব মহৎ গুণাবলী বর্তমান ছিল। এ থেকে

নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, নবী কখনও বখীল বা কৃপণ হন না। এই কারণেই মহানুভবতার উল্লিখিত গুণাবলী নবীর বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হয়েছিল।

বস্তুত কার্পণ্য কর্মের ফল লাভের উপর দৃঢ় প্রত্যয় না থাকার কারণেই ব্যক্তিগতদের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কৃপণ ব্যক্তি নিজেদের শ্রমার্জিত ধন-দৌলত অন্যদেরকে দিতে কখনও মনের দিক দিয়ে প্রস্তুত হয় না। কিয়ামতের দিন দোযখীদের জিজ্ঞাসা করা হবেঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ - قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ - وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ - وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَا ئِضِيْنَ-وَكُنَّا نَكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ -

(المد ثر- ٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦)

তোমাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে কেন? জবাবে তারা বলবেঃ আমরা নামাযী ছিলাম না। তদুপরী গরীব মিসকীনকে আমরা খাবার খাওয়াইতাম না। বিরোধীদের সাথে মিলিত হয়ে আমরা দ্বীন ইসলামের উপর নানা আক্রমণাত্মক কথাবার্তা বলতাম। আর এসব এজন্য ছিল যে, আমরা আমাদের আমলের পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়শীল ছিলাম না—পরকালকে অসত্য মনে করতাম।

এ থেকে স্পষ্ট হলো যে, কৃপণতা মানুষকে দোযখ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। আর এই কৃপণতা আমলের প্রতিফল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় না রাখার কারণেই হয়ে থাকে। অন্য কথায় যে লোক পরকালে বিশ্বাসী, সে লোকের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে। পরকাল অবশ্যই হবে এবং দুনিয়ার জীবনে মানুষ যা করে তার প্রতিফল অবশ্যই পেতে হবে; এই যাদের বিশ্বাস তারা অবশ্যই কৃপণ হবে না। পরকালের প্রতি ঈমানহীন ব্যক্তিরা কৃপণ না হয়ে যায় না। তারা মনে করে, যেসব ধন-সম্পদ আমরা পেয়ে গেছি, তা যদি হারাই কিংবা তাতে যদি কমতি পড়ে যায়, তাহলে পূরণ করার আর কোন সুযোগ হবে না। পরকালে কিছু পাওয়ার তো তাদের কোন আশাই নেই। আল-কুরআনে এই কথাই বলা হয়েছেঃ

اَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ - فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ-وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ -

(الماعون ٣-٢-١)

তুমি কি ভেবে দেখেছ সেই ব্যক্তির কথা, যে বিচারের দিনকে অসত্য মনে কর? এতো সেই, যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে নিজে

খাবার খাওয়ানো তো দূরের কথা, সেজন্য অন্যান্য লোকদেরকে উৎসাহিতও করে না।

এই কারণেই পরকালে কর্মফল প্রাপ্তির প্রতি যাদের ঈমান নেই, তাদের নেক আমল ও দান-দক্ষিণা কোন কাজেই লাগে না, আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হয় না এবং পরকালে তা কোন সুফল দেবে না। কেননা এরূপ ব্যক্তির দান সেই নিষ্ঠার উপর ভিত্তিশীল হয় না, যা থাকলেই তবে আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কৃপণ ব্যক্তি কাউকে কিছু দিলেও তার বিনিময় সে এই দুনিয়ায়ই পাওয়ার জন্য লালায়িত হয়। যেখানে তার কোন আশা থাকে না, সেখানে সে এক পয়সাও ব্যয় করতে রাযী হয় না। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মানুষের নেক আমলের শুভ ফল আল্লাহ্র নিকট রয়েছে, একথা সে বিশ্বাসই করে না।

যেসব লোক আল্লাহ্র কিয়ামত স্বল্প পরিমাণ মনে করে, আল্লাহ্ তাদেরকে অসম্মানিত করেছেন, তারাও চরম মাত্রায় কার্পণ্য করে থাকে। ইয়াতীমকে তারা কোন রূপ সাহায্য সহযোগিতা দিতে আদৌ প্রস্তুত হয় না।

ইরশাদ হয়েছেঃ

“না কখনই নয়, বরং সত্য কথা হচ্ছে তোমরা ইয়াতীমর প্রতি কোনরূপ সম্মান দেখাও না। তোমরা মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত কর না। তোমরা মীরাস খেয়ে ফেল আর ধনমালের প্রেমে তোমরা আকুল হয়ে থাক।” (আল-কুরআন)

আয়াত কয়টিতে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। মূলত এই সব কয়টি কথাই কার্পণ্যের বিভিন্ন রূপ। কৃপণ ব্যক্তিই ইয়াতীমকে দুই চোখের বিষ মনে করে। মিসকীনকে নিজে তো খাবার দেয়ই না, অন্যদেরকে সেজন্য উৎসাহিতও করে না। আর যেসব লোক ধন-মাল রেখে মরে যায়, তাদের ধনমাল বেমালুম খেয়ে হজম করে ফেলে, আসল উত্তরাধিকারীদের হাতে তা পৌছিয়ে দেয় না। আর ধন-মালের প্রতি খুব বেশী ভালোবাসা পোষণ করে, তার মায়ায় তা মোটেই হাতছাড়া করতে রাযী হয় না।

এই কৃপণ চরিত্রের লোক সম্পর্কেই বলা হয়েছেঃ

اَلَّذِیْ جَمَعَ مَا لًا وَّعَدَّدَهٗ-يَحْسَبُ اَنَّ مَا لَهٗۤ اَخْلَدَهٗ-كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ- (الهمزة-٤-٣-٢)

যে ধন-মাল সঞ্চয় করে এবং গুণে গুণে রাখে, মনে করে, তার ধন-মাল তাকে চিরঞ্জীব বানিয়ে দেবে। না, এ কথা সত্য নয়। বরং সে লোককে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

যেসব লোক ধন-মাল পাই পাই করে জমা করে রাখে, নেক কাজে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করে না, তাদেরকে জাহান্নামের হুমকি দেয়া হয়েছেঃ

كَلَّا اِنَّهَا لَظٰى - نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى - تَدْعُوا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى- وَجَمَعَ فَاَوْعٰى - (المعارج -١٨-١٥)

কক্ষণই নয়, তা উত্তপ্ত আগুন, চামড়া মাংস লেহন করে নেবে। তা ডেকে নিজের দিকে আহবান করবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যে সত্য দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং ধন-মাল সঞ্চয় করেছে ও ছেঁক দিয়ে দিয়ে রেখেছে। (আল-মায়ারেজঃ ১৫-১৮)

পরকালে ব্যক্তির খারাপ পরিণতির দুইটি কারণ এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে প্রকৃত সত্য দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং তার প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করা। আর দ্বিতীয় কারণ হলো দুনিয়ার পূজা, বৈশয়িকতাবাদ ও কার্পণ্য। এর দরুন মানুষ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে, কোন মঙ্গলময় ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে না।

কৃপণ ভুলে যায় যে, ধন-দৌলতের নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য নেই, তা শুধু দ্রব্যসম্ভার লাভ করার মাধ্যম। সোনা-রূপা নিজেই মানুষের খাদ্য-পানীয় নয়। কাজেই তাকে সঞ্চয় করে রাখার কোন কল্যাণ নিহিত নয়। অতএব তাকে উচ্চতর মহানতর লক্ষ্য অর্জনে ব্যয় করা আবশ্যক। আর তাই তার যথার্থ ব্যয় ক্ষেত্র!। এই উচ্চতর লক্ষ্য সেই আল্লাহ্ তা'আলা 'ফী সাবীলিল্লাহ'—আল্লাহ্র পথে বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই যে লোক স্বীয় অর্জিত ধন-সম্পদ এই থেকে ব্যয় করে না, সে শুধু টাকা-পয়সাই নিজের নামে জমা করে না, বরং নিজের জন্য আগুনের কুণ্ডলি জ্বালায়।

যেসব লোক স্বর্ণ-রৌপ্য, টাকা-পয়সা পুঁজি করে রাখে, তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন সেসব দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, পরে তা দিয়ে তাদের কপাল, পার্শ্ব ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে এবং বলা হবেঃ "এ তো সেই জিনিস, যা তোমরা পুঁজি করে রেখেছিলে নিজেদের জন্য। অতএব তোমাদের পুঁজি করা জিনিস এখন তোমরাই ভোগ কর।" (আল-কুরআন)

বখীল ব্যক্তি এও বুঝে না যে, স্বর্ণ-রৌপ্য, ধন-দৌলত ব্যক্তির সম্পত্তি না, সমাজ সমষ্টি অর্থাৎ সাধারণ জনগণই হচ্ছে তার প্রকৃত অধিকারী, যদিও তা বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট পড়ে থাকে। কিন্তু ব্যক্তির হাতে থাকা সম্পদ মূলত সমষ্টির অধিকারের সম্পদ, ব্যক্তিদের হাতে তা থাকে নিতান্তই আমানত স্বরূপ। অতএব তা সমষ্টির মধ্যে সব সময় আবর্তিত হতে থাকবে, এটাই তার প্রবণতা ও প্রকৃতি। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি যদি তা একান্তই নিজের সম্পদ মনে করে আটক করে রাখে তাহলে তা হবে সমষ্টির উপর জুলুম। সে হবে জালিম। জালিম সমাজ-সমষ্টির উপর, জালিম নিজের উপর। যেখানে সে নিজে একজন আমানতদার মাত্র, সেখানে নিজেকে মালিক বানিয়ে নিলে ও সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখলে নিজেকে অপরাধী বানানো হবে। নিজেকে অপরাধী বানালে নিজেই নিজের হক্ কেড়ে নেয়ার পাপে নিজেকেই জড়িত করা হবে। কেননা সে যে সমাজ সমষ্টির একজন, সেই সমাজ-সমষ্টিরই ক্ষতি সাধন করেছে সে নিজে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ – (ال عمران – ١٨٠)

আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে যে সম্পদ লোকদের দিয়েছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, তাদের কৃপণতা তাদের জন্য মঙ্গলকর, বরং তা তাদের জন্য খুব খারাপ, ক্ষতিকর। তারা যা নিয়ে কৃপণতা করে তা তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে কিয়ামতের দিন।

অর্থাৎ যে ধন-সম্পদকে সে কার্পণ্যের দরুন নিজের গলার হার বানিয়ে নিয়েছিল, কিয়ামতের দিন তা বাস্তবভাবেই তাদের গলায় অজগর বানিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হবে এবং ঝুলন্ত বোঝা তাকে বহন করতে হবে। এ অজগরের বিষাক্ত ছোবল তার মুখের মাংস খাবলা খাবলা করে খুলে নেবে।

হাদীসে বলা হয়েছে, কার্পণ্য করে পুঁজি করে রাখা ধন-সম্পদ বিষাক্ত সাপ রূপে কৃপণের গলায় ঝুলন্ত থাকতে দেখা যাবে। (বুখারী)

কৃপণ মানুষ—আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সাধারণ মানুষকে ভালবাসতে পারে না, আল্লাহ্‌র পথের কার্যাবলীকে ভাল চোখে দেখে না। তার প্রেম ভালবাসার একমাত্র পাত্র হয় তার হাতে রক্ষিত ধন-সম্পদ। তারই প্রেমে সে হয় আত্মহারা। জীবনের চরম লক্ষ্য রূপেই সে দেখে ধন-দৌলতকে। আল্লাহ্ বলেন, এইসব লোক আল্লাহ্‌র ভালবাসার সম্পদ থেকে মর্মান্তিকভাবেই বঞ্চিত হয়ে থাকবে।

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْ مُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ - (الحديد -٢٤-٢٣)

আল্লাহ্ অহংকারী গৌরবী মাত্রকেই পছন্দ করেন না। অহংকারী-গৌরবী তো সেসব লোক, যারা নিজেরা বখিলী করে এবং অন্যান্য লোককেও বখিলী করতে আদেশ করে। (আল-হাদীদঃ ২৩, ২৪)

অর্থাৎ যারা বখিলী করে তারা অহংকারী বলেই তারা বখিলী করে। আর যারা বখিলী করে তারা নিজেরা বখিলী করেই ক্ষান্ত হয় না, তাকেই যথেষ্ট মনে করে না; বরং তারা বখিলীর একটা পরিবেশ গড়ে তোলে, অন্যান্য লোকও যাতে তা করে সেই হীন নীতি গ্রহণ করে, তার জন্য তারা প্রাণপণে চেষ্টা চালায়—এটাই স্বাভাবিক। এই কারণেই বখীল লোকেরা ও অহংকারী লোকেরা আল্লাহ্র ভালবাসা পেতে পারে না। আর আল্লাহ্র ভালবাসা থেকে বঞ্চিত লোকেরা জনসাধারণ তো দূরের কথা, নিজের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনেরও ভালবাসা পায় না। তারাও তার প্রতি ভালবাসা পোষণ করবে, সে তো দূরের কথা; বরং তারা তাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণাই করবে। তার সাথে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক থাকাকেও নিজেদের জন্য লজ্জার কারণ মনে করবে।

ধনশালী ব্যক্তিরা যেমন কৃপণ হয়, তেমনি হয় অহংকারী। অহংকার ও কৃপণতা পরস্পর ওতপ্রোত, একটি হলে অন্যটা কোন-না-কোন ভাবে অবশ্যই থাকবে। ধনীরা নির্ধন-গরীব লোকদেরকে হীন জ্ঞান করে। ফলে সে আল্লাহ্ ও বান্দা জনগণের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য বিবেচিত হতে থাকে। এক কথায় ধনীরা বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েও কিছুমাত্র সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে না। প্রধানত এই কৃপণতার কারণে। তাকে সর্বত্র লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হতে হয়। কিন্তু নিজেকে লোকদের নিকট লাঞ্ছিত অপমানিত বানাবার কোন অধিকার কারোর থাকতে পারে না। যে করে সে নিজের উপর জুলুম করে, নিজের হক নিজেই কেড়ে নেয়।

কুরআনে চরম মাত্রায় কৃপণ ব্যক্তির প্রতীক হিসেবে কারূনকে পেশ করা হয়েছে। কারূন হযরত মূসা (আ)-র সময়ে এবং তাঁরই গোত্রের একজন লোক ছিল। তখন মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায় বলা যায়। সেই সময় কারূনের ধন-সম্পদের মোট পরিমাণ কত ছিল এবং ধাতব মুদ্রায় তার ওজন কি ছিল তা তো কারোরই জানবার কথা নয়। তার ধন-ভাণ্ডারের শুধু চাবির গুচ্ছ বহন করতেই কয়েকজন ব্যক্তির প্রয়োজন হতো এবং তাও খুবই কষ্ট সহকারে বহন

করা হতো। এত কিছু ধন-সম্পদের মালিক হয়েও আল্লাহ্র শোক্র আদায় করার পরিবর্তে সে বরং দাবি করত যে, এই বিপুল ধন-সম্পদ তো আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও শ্রম-মেহনতের বদৌলতে লাভ করেছি। অথচ তার পূর্বেও মানব সমাজে তার চাইতে অনেক বড় বড় ধনী লোক ছিল এবং তাদের পরিণতি যে অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়েছিল, সে কথা তার জানা ছিল না। এই কারূনের পরিণতিও তার পূর্বসুরিদের ন্যায় অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়েছিল। তার ধন-ভাণ্ডার ভূগর্ভে ধ্বসে গিয়েছিল। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَاَ شَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا – (القصص -٧٨)

ও কি জানে না, আল্লাহ্ তার পূর্বে শত শতাব্দী কালের ইতিহাসে এমন সব লোককে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শক্তি-সামর্থ্য ও অর্থ-সম্পদ সংগ্রহে তার (কারূনের) চাইতেও অনেক শক্ত ব্যক্তিত্ব ছিল? (আল-কাসাসঃ ৭৮)

তাঁকে বলা হয়েছিল, তুমি ধন-সম্পদ পাওয়ার খুশীতে মেতে যেও না বরং আল্লাহ্র দান পেয়ে তদ্দ্বারা পরকালীন জীবনে কল্যাণ পাওয়ার কাজে ব্যয় ও ব্যবহার কর। আল্লাহ্ যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও তেমনি লোকদের প্রতি অনুগ্রহ কর। আর ধন-সম্পদকে দুনিয়ার সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টির কাজে ব্যয় করো না। কিন্তু সে কারূর কোন নসীহত শুনতেই প্রস্তুত হয়নি। ফলে আল্লাহ্ তার কঠিন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। বলেছেনঃ

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ – (القصص - ٨١)

শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার প্রাসাদকে যমীনে ধ্বসে দিলাম। পরন্তু তার সাহায্যকারী এমন কেউ কোথাও ছিল না, যে আল্লাহ্র মুকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে পারে, সে নিজের কোন সাহায্য করতে পারেনি।

রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে কারূন আবূ লাহাব সম্পর্কেও বলা হয়েছেঃ

مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَا لُهٗ وَمَا كَسَبَ – (اللهب -٢)

(আবূ লাহাবকে) তার ধন-মাল এবং অন্য যা কিছু সে উপার্জন করেছিল, কোন কল্যাণই দিতে পারেনি। (আল-লাহাবঃ ২)

কোন ব্যক্তি বা জনসমষ্টির নিকট ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া সেই ব্যক্তি ও জনসমষ্টির পক্ষে কোন কল্যাণ নিয়ে আসে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণে ব্যয়িত না হবে। কিন্তু কৃপণ সেজন্য প্রস্তুত নয়। ফলে সম্পদের যে অংশ অন্যান্য ও সমষ্টির জন্য ক্ষতিকর তা নিরর্থক হয়ে যায়। সেই ক্ষতি শেষ পর্যন্ত গোটা সমাজকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেঃ

هَاَ نْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِ نَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ –

(محمد – ٣٨)

লক্ষ্য কর, তোমাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে ধন-মাল ব্যয় করার জন্য। জবাবে তোমাদের কিছু লোক কার্পণ্য করে—অথচ যে লোক কার্পণ্য করে, সে আসলে নিজের সাথে নিজেই কার্পণ্য করে। আল্লাহ্ তো মুখাপেক্ষীহীন, ধনশালী। তোমরাই বরং দারিদ্র্যের মুখাপেক্ষী (মুহাম্মদঃ ৩৮)

কৃপণ ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে নানা বিপদ-আপদে জর্জরিত হয়ে থাকে। বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ভাল খানা-পিনা তার কপালে জুটে না। না পোশাক, না ভাল ঘর-বাড়ি, না মান-সম্মান। সকলেই তাকে ঘৃণা করে, লাঞ্ছিত অপমানিত মনে করে। গরীব লোকেরা তার জন্য বদদোয়া করে। যে পরিবারের জন্য, ছেলে-মেয়ের জন্য সে পাই-পাই করে সম্পদ সংগ্রহ করে, কার্পণ্য করে ধন-সম্পদ বাঁচিয়ে রেখেছে, তারা পর্যন্ত তাকে পছন্দ করে না। বরং মনে করে, এই হাড়-কৃপণ ব্যক্তি না মরা পর্যন্ত ঐ ধন-দৌলতকে ব্যবহার করা যাবে না। অনেক ক্ষেত্রে তার প্রিয় ছেলেরাই তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে তার সঞ্চিত বিপুল বৈভব হস্তগত করার জন্য উদ্যত হয়। তাছাড়া সে নিজে কষ্ট করে, না খেয়ে থেকে, কার্পণ্য করে যে বিপুল সম্পদ জমা করেছে, তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা সেই ধন-সম্পদ দুই হাতে উড়াতে থাকে, বেহুদা খরচ করে, অন্যায় কাজে ব্যয় করে অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ করে ফেলে।

এইজন্যই আল্লাহ্ প্রত্যেক সম্পদশালী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْ تِىَ اَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْ تَنِىْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ –

(المنفقون – ١٠)

আমরা তোমাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি, তা থেকে তোমাদের কারোর মৃত্যুর পূর্বেই ব্যয় কর। (অন্যথায় মৃত্যু উপস্থিত হলে) বলবে, হে রব্ব্‌ তুমি কেন নিকটবর্তী অপর একটি সময়ের জন্য আমার মৃত্যু বিলম্বিত করে দাও না। তাহলে তো আমি সত্য পালনকারী ও নেকবান লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।

কিন্তু মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট সময় মুহূর্তের জন্যও এদিক-ওদিক হতে পারে না। ফলে তখনকার আফ্‌সোস একেবারেই নিষ্ফল ও নিরর্থক হয়ে যেতে বাধ্য।

অনেক দরিদ্র ব্যক্তি মুখে বড় বড় কথা বলে। বলে, হলাম গরীব, যদি ধনী হতাম, আল্লাহ্‌ আমাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিতেন, তাহলে আমি দেখিয়ে দিতাম দান-সাদকা কাকে বলে! কিন্তু তারা যখন ধনশালী হয়, তখন এসব কথাবার্তা বেমালুম ভুলে যায়। বলা হয়েছেঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ-فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ -

(التوبه -٧٦ -٧٥)

তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যদিও আল্লাহ্‌র নিকট ওয়াদা করেছে এই বলে যে, তিনি যদি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই সত্য নীতি অবলম্বনকারী ও নেক আমলকারী হব। কিন্তু পরে আল্লাহ্‌ যখন তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করলেন, তখন তারা কার্পণ্য করতে শুরু করে, সত্য নীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ফিরিয়েই থাকে সব সময়।

কার্পণ্য মানুষের মধ্যে মুনাফিকী সৃষ্টি করে।

"আল্লাহ্‌ এই কার্পণ্যের পরিণতিতে তাদের দিলে মুনাফিকী সৃষ্টি করে দিয়েছেন।" (আল-কুরআন)

এই কারণে নবী করীম (স) বলেছেনঃ সত্যিকার মু'মিনদের মধ্যে দুইটি চরিত্র—খাসলাত—একত্রিত হতে পারে না। তা হচ্ছে কৃপণতা ও চরিত্রহীনতা' (তিরমিযী)। নবী করীম (স) কার্পণ্য থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সব সময় আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করতেন। দ্বীন-ইসলামে যাকাত-সাদকাত করাও নফল সওয়াবের কাজ বানানো হয়েছে এজন্যই যে, মানুষ এসব বদ্‌ চরিত্র থেকে মুক্তি লাভ করবে।

মোটকথা, কার্পণ্য একটি মহা চরিত্রহীনতা। যে ব্যক্তি কৃপণতা করে, সে নিজেকে অপমানিত-লাঞ্ছিত করে জনসমাজে। কৃপণ বলে লোকেরা তাকে গালমন্দ বলে। এভাবে আল্লাহ্‌র সম্মানিত সৃষ্টি একজন মানুষ চরমভাবে অসম্মানিত হয়ে পড়ে। নিজেকে এইরূপ অসম্মানিত করার কোন অধিকারই কারোর থাকতে পারে না। যে তা করে, সে নিজের উপর নিজেই জুলুম করে, সে নিজেই নিজেকে নিজের হক থেকে বঞ্চিত করে। অথচ তার উপর ধার্য আল্লাহ্‌র হক্-এর পর-পরই তার উপর ধার্য হয়েছিল তার নিজের হক্—নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য। সেই হক্ সে আদায় করেনি, সে কর্তব্য সে পালন করেনি। আর তার অর্থ, সে নিজেই নিজের উপর জুলুম করেছে। ফলে তার মত জালিম আর কেউই হতে পারে না। সে হচ্ছে মহা জালিম।

পিতা-মাতার হক

এ পর্যন্তকার বিস্তারিত আলোচনায় আমরা প্রধানত কুরআনের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে, মানুষের উপর মহান আল্লাহ্‌র হক্ সর্বপ্রথম। তার পরই নিজের উপর নিজের হক্। আল্লাহ্‌র হক সর্বপ্রথম এজন্য যে, তিনিই বিশ্বজাহানের এবং এই পৃথিবীর মহান সৃষ্টিকর্তা। মানুষ তাঁরই এক বিশেষ সৃষ্টি। এই বিশ্বলোক, পৃথিবী ও মানুষকে দয়া করে তিনি সৃষ্টি না করলে মানুষের জীবনই সম্ভব হত না, হক-হুকুকের কোন প্রশ্নই উঠতো না। অতঃপর মানুষের নিজের উপর নিজের হক্। কেননা মানুষ যদি নিজের উপর নিজের হক্ আদায় না করে, তাহলে তার দ্বারা অন্য করোর হক্ আদায় হবে এমন আশা কিছুতেই করা যেতে পারে না।

নিজের উপর নিজের হক্ আদায় করার পরই অন্য লোকদের হক্ আদায় করা সম্ভব হতে পারে। এই পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই, মানুষের উপর অন্যান্য মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যার হক্ ধার্য ও আরোপিত হচ্ছে, তারা হয় একসাথে পিতা ও মাতা।

কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক্, আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার করণীয় উল্লেখের পরই উল্লিখিত হয়েছে পিতা-মাতার হক্-এর কথা। কেননা আল্লাহ্ সৃষ্টি না করলে মানুষের পক্ষে এই জীবন লাভ করা সম্ভব হত না—এ যেমন পরম সত্য, ঠিক তেমনি এও পরম সত্য যে, আল্লাহ্ মানুষকে পিতা-মাতার মাধ্যমেই সৃষ্টি করেছেন। পিতা-মাতা—পিতার ঔরস ও মায়ের গর্ভে না হলে এ দুনিয়ায় মানুষের আগমন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে থাকত।

এ দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টির যে ধারা মহান সৃষ্টিকর্তা শুরু করেছেন, তার সূচনায় সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে একজন পুরুষ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর

তারই অংশ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন একজন স্ত্রীলোক। পরবর্তীতে এই পুরুষ ও স্ত্রীলোক স্বামী স্ত্রী হিসাবে দাম্পত্য জীবন শুরু করলে মানুষের বংশের দ্বারা চলতে শুরু হয় এবং তা চলতে থাকে স্বামীর ঔরস ও মায়ের জরায়ুর মাধ্যমে। ইরশাদ হয়েছেঃ

اَلَّذِيْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَخَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ-ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ - (السجدة -٨-٧)

আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির কাজ শুরু করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর তার বংশের ধারা চালিয়েছেন নিকৃষ্ট পানি দিয়ে।

'নিকৃষ্ট পানি' বলতে পিতার ঔরস শুক্রকীট বুঝিয়েছেন, যা মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করার পর বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় অতিক্রম করে—মাতৃগর্ভে পূর্ণ নয়-দশ মাস (বা একটা মেয়াদ কাল) অবস্থান করে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতি লাভ করে ভূমিসাৎ হয়। দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টির এটাই হচ্ছে একমাত্র ধারা। এই ধারা অনুসরণ ব্যতীত এ দুনিয়ায় মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র পর পরই মানুষের উপর সবচাইতে বেশী অনুগ্রহ হচ্ছে এই মানুষ দুটির, যাদের মধ্যে পুরুষটি তার পিতা এবং নারীটি তার মাতা। তাই আল্লাহ্‌র পর পরই মানুষের উপর সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক হক্‌ হচ্ছে এই পিতা ও মাতার। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا-وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا - (بنی اسرائیل - ٢٤-٢٣)

তোমার রব্ব্‌ চূড়ান্ত ফয়সালা ও ফরমান জারী করেছেন যে, তোমরা কেবলমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারোরই দাসত্ব করবে না, পিতা-মাতার সাথে অবশ্যই উত্তম ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট তাদের কোন একজন (পিতা কিংবা মাতা) অথবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় যদি অবস্থান করে তবে তুমি তাদেরকে 'উহ্‌' পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা ও সম্ভ্রমপূর্ণ কথাবার্তা বলবে এবং দয়া-অনুকম্পা সহকারে বিনয়ের হাত তাহাদের জন্য সব সময় বিছিয়ে দেবে এবং তাদের জন্য সব

সময় দোয়া করতে থাকবে। এই বলেঃ হে আমার রব্ব্‌, তুমি তাদের দু'জনার প্রতি রহ্‌মত কর যেমন রহ্‌মত সহকারে তারা দু'জন মিলিতভাবে আমাকে লালন-পালন করেছে আমার শিশু অবস্থায়।

আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বান্দার উপর সর্বপ্রথম হক হচ্ছে মহান রব্ব্‌-এর এবং তা হচ্ছে, বান্দা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারোরই দাসত্ব—অধীনতা কবুল করবে না, অন্য কারোরই সার্বভৌমত্ব মেনে নেবে না। তার পরই হক্‌ হচ্ছে পিতা-মাতার—তা-ই পিতা-মাতার প্রতি বান্দার কর্তব্য।

উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক্‌-এর কথা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। বলা যায়, যতটা সংক্ষিপ্তভাবেই কথাটি বলা হোক, পূর্ণ কথাই বলা হয়েছে। বলার কিছুই বাকি রাখা হয়নি। আর তারপরই বলা হয়েছে বান্দার উপর পিতা-মাতার হক্‌ এর কথা।[১]

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের কথা এখানে যেভাবে বলা হয়েছে, তাতে সর্বপ্রথম বলা হয়েছে, উভয়ের প্রতি 'ইহ্‌সান' করতে। আভিধানিকদের মতে 'ইহ্‌সান'-এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক অর্থে অন্য লোকদের সাথে শুভ ও মঙ্গলময় আচরণ—তাদের কল্যাণ সাধন বোঝায়। আর দ্বিতীয় অর্থ কোন ভাল কথা জানা ও নেক কাজ সম্পন্ন করা বোঝায়। এক অর্থে দয়া-অনুগ্রহও বোঝায়। অর্থাৎ পিতা-মাতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদের অক্ষমতা নানাভাবে প্রকট হয়ে উঠে। তখন তাদের নানামুখী প্রয়োজন পূরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে, যা করা তাদের নিজেদের পক্ষে সম্ভব হয় না।, অন্য কারোর করে দেয়ার প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দেয়। সেই 'অন্য' বলতে প্রথমেই আসে তাদের ঔরসজাত ও গর্ভজাত সন্তানরা। তাদেরই কর্তব্য হয়ে পড়ে পিতা-মাতার সেই প্রয়োজনসমূহ পূরন করে দেয়া। তারা বয়োবৃদ্ধ, নানাভাবে অক্ষম। এই অক্ষমতা যেমন উঠা-বসায় ও চলাফেরায় প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তেমনি কামাই রোজগারের অক্ষমতাও দেখা দেয়। সর্বোপরি তাদের বার্ধক্য ভারাক্রান্ত মন ও দেহ চায় নিকটবর্তীদের নিকট সর্বতোভাবে সহযোগিতা। যখন তারা উঠতে পারে না তখন উঠতে সাহায্য করা, যখন চলতে পারে না তখন চলায় সাহায্য করা, যখন আর উপার্জন করতে পারে

১. আমরা অবশ্য বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক্‌-এর পরই বান্দার নিজের হক্‌-এর কথা উল্লেখ ও আলোচনা করেছি। কেননা যে লোক নিজের উপর ধার্য নিজের হক্‌ আদায় করে না, সে পিতা-মাতার হক্‌ আদায় করতে কখনোই প্রস্তুত হতে পারে না। আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করার নিয়মও তিনিই শিক্ষা দিয়েছেনঃ

"হে রব্ব্‌ আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা-মাতাকে। এতে পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার আগেই নিজের জন্য ক্ষমা চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আমরা এই নীতিকেই অনুসরণ করেছি।"

না বলে অন্ন-বস্ত্রের অভাব দেখা দেয়, তখন তাদের অন্ন-বস্ত্র প্রয়োজন মত যুগিয়ে দেয়া সন্তানদেরই অতিবড় কর্তব্য হয়ে দেখা দেয়।

বাহ্যিক কথাবার্তায় শালীনতা-ভদ্রতা দেখানো বিশেষ করে পিতামতার সাথে ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং সম্মানজনক সম্বোধন ও কথোপকথনের গুরুত্ব অপরিসীম। সন্তান যদি পিতা-মাতার মনে আঘাত দেয় বা অপমানজনক কথাবার্তা বলে, তাহলে তাদের মনের আঘাতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সহসাই তাদের মুখে মর্মভেদী 'উহ্' শব্দটি ধ্বনিত হবে। বস্তুত 'উহ্' শব্দটি দীর্ণ-বিদীর্ণ কলিজার অভিব্যক্তি। এই ধ্বনি পিতা-মাতার কণ্ঠে উচ্চারিত হলে বোঝাই যাবে যে, মনে বড় দুঃখ পেয়েছে, কলিজায় আঘাত লেগেছে। তখন তাদের মনোভাব এও হতে পারে যে, কেন বিয়ে করলাম, আর এমন সন্তান জন্ম দিলাম, যার অপমানজনক কথায় আজ দুঃখ পেতে হচ্ছে, অপমানিত হতে হচ্ছে। যার মনে এই ভাব জাগতে পারে যে, কেন এমন কুসন্তান গর্ভে দশ মাস ধরে ধারণ করলাম, কেন প্রাণান্তকর প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করলাম এবং কেন কষ্ট স্বীকার করে এই সন্তানের শৈশবকালে লালন-পালন করে বড় করে তুললাম। তাদের মনে এজন্য কঠিন অনুতাপও জাগতে পারে। এহেন সন্তানের প্রতি প্রবল অসন্তোষ এবং বদ্দোয়া, যা সন্তানের জন্য কখনই কল্যাণকর হতে পারে না, বরং সর্বাংশে চরম অকল্যাণ ডেকে আনতে পারে তাদের জীবন, অভিশাপ হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হতে পারে অশুভ বৃষ্টি।

শুধু তাই নয়, পিতা-মাতার এই মনোভাব সংক্রমিত হতে পারে গোটা সমাজের মধ্যে। সমাজের লক্ষ লক্ষ বিবাহেচ্ছুক যুবক-যুবতীর মধ্যে, তাদের মনে দাম্পত্য জীবনের প্রতি ও তার পরিণতিতে সন্তান জন্মদানের প্রতি কঠিন অনীহা জেগে উঠতে পারে। তাহলে তা হবে গোটা সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তার ফলে মানব বংশের অগ্রগতি, বিস্মৃতি ও ধারাবাহিকতা সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তো মানব বংশের অগ্রগতি, বিস্তৃতি ও অব্যাহত ধারাবাহিকতা চান। তাই তিনি সন্তানের প্রতি আদেশ করেছেন পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করতে, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে, ভাল আচরণ করতে, সম্মান রক্ষা করে কথাবার্তা বলতে। পক্ষান্তরে এমন আচরণ করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন, যার ফলে তারা মনে কষ্ট পেতে পারে, নিষেধ করেছেন তাদেরকে গালাগাল দিতে, মন্দ কথা বলতে, ভর্ৎসনা করতে।

বরং তার বিপরীত পিতা-মাতার খেদমতে দুই বিনয়ী বাহু বিছিয়ে রাখতে বলেছেন সর্বক্ষণ এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সব সময় দোয়া করতেও

নির্দেশ দিয়েছেন। কি ভাষায় দোয়া করা উচিত, তাও তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ শেখানো এই দোয়াটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বলেছেনঃ বল, হে রব্ব্ আমার শিশুকালে আমার পিতা-মাতা দু'জনে মিলে যেমন করে আমাকে লালন-পালন করেছেন, তুমি তেমনিভাবে তাদের প্রতি রহমত কর।

অর্থাৎ আমি এক সময় শিশু ছিলাম, আমার কোন কর্মক্ষমতা ছিল না, খাদ্য প্রস্তুত করা তো দূরের কথা, কোন কিছু করা বা উপার্জন করারও কোন সাধ্য আমার ছিল না। ধরে খাওয়াও সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। সেই সময়ে, পিতা আমার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় যোগাড় করে দিয়েছেন, মাতার বুকের স্তন থেকে তার রক্তের তৈরী দুগ্ধ সেবন করে বেঁচে থাকার শক্তি সংগ্রহ করার সুযোগ দিয়েছেন, স্তনের বোটা আমার মুখে পুরে দিয়েছিলেন তার স্নেহময় বুকে চেপে ধরে। আমি ভেজা বা ময়লার মধ্যে পড়ে থাকলে অনতিবলম্বে আমাকে ময়লামুক্ত করে গরম শয্যায় স্থান দিয়েছেন, যা করার কোন সাধ্যই আমার ছিল না। আর পিতা-মাতা আমার জন্য যাই করেছেন, অন্তরের অকৃতিম দরদ দিয়ে, স্নেহ-বাৎসল্য দিয়ে করেছেন। তখন তাঁরা সক্ষম ছিলেন কিন্তু এখন তাঁরা অক্ষম হয়ে পড়েছেন। সেদিন আমি যেমন পিতা-মাতার অন্তরের দরদ ও স্নেহ-ভালবাসার মুখাপেক্ষী ছিলাম, আজ তাঁরা এই বার্ধক্য বয়সে তেমনি আন্তরিক দরদ ও স্নেহ-ভালবাসার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছেন। অতএব হে রব্ব্, আজ তুমি তাঁদের প্রতি তেমনি রহমত বর্ষণ কর, যেমন রহমত তাঁরা আমার প্রতি বর্ষণ করেছেন আমার শৈশবকালীন অক্ষমতার সময়ে আমার লালন-পালনে। সেদিন আমি যেমন সেই রহমত পূর্ণ লালন পালনের মুখাপেক্ষী ছিলাম, আজ তাঁরা তেমনি দয়া-অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছেন বার্ধক্যের অক্ষমতাকালে অথবা জীবনান্তে পরকালীন অক্ষমতার সময়ে।

বস্তুত কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য—সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক্-এর কথা বিস্তারিতভাবে বলেছেন। সূরা লুকমানের আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَا
مَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَ يْكَ - (لقمٰن - ١٤)

আমরা মানুষকে পিতা-মাতার হক্ বুঝবার জন্য নিজে থেকেই তাকীদ করেছি। বলেছি, তার মা দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে বহন করেছে। আর দুইটি বৎসর লেগেছে তার দুধ ছাড়াতে। অতএব (হে মানুষ) তোমরা আমার শোকর কর, শোকর কর তোমার পিতা-মাতার।

আয়াতটিতে প্রথমে মানুষকে পিতা-মাতা উভয়ের প্রতি তাদের কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। তার পরই বিশেষভাবে তার মা যে তাকে নিয়ে কষ্ট স্বীকার করেছে, তার কথা বলা হয়েছে।

সন্তান নিয়ে মা'র কষ্ট যে কত মর্মস্পর্শী তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মা তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও বহন করে ছয় মাস থেকে দশ মাস পর্যন্ত। এই গর্ভ বহন করা যে কতখানি কষ্টকর, তা গর্ভবতী মা-ই মর্মে মর্মে বুঝে। অন্যের পক্ষেতা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এই গর্ভ বহনের কষ্ট স্বীকারের পর আসে তাকে ভূমিষ্ট করার কঠিন মুহূর্ত। প্রসব-যন্ত্রণা যে কতখানি কষ্টদায়ক,তা অন্যেরা কি বুঝবে? সন্তান প্রসব করার কষ্ট স্বীকার করার পর সেই অক্ষম সন্তানকে লালন-পালন করার প্রশ্ন দেখা দেয়। এই গর্ভকাল সন্তান প্রসব ও সন্তান লালনের সময় বেশী দীর্ঘ। এই দীর্ঘ সময় মাকে অত্যন্ত দুর্বলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। দেহ যেমন দুর্বল, মন তেমনি অত্যন্ত নাজুক। সন্তান প্রসবকালে অনেক মাকে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়।

এই প্রেক্ষিতে মা'র প্রতি সন্তানের কর্তব্য যে কতখানি বড় হযে দাঁড়ায়, তা সহজেই বোঝা উচিত। মা যদি সন্তানের জন্য এতখানি কষ্ট স্বীকার করতে রাযী না হত, তাহলে দুনিয়ায় মানুষের আগমন সম্ভবপর হত না। কাজেই সন্তান গর্ভে ধারণ করা, তাকে জীবন্ত প্রসব করতে রাজী হওয়া এবং শৈশবের অক্ষমতাকালীন লালন-পালন করতে, তার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে প্রস্তুত হওয়া মার দিক থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সন্তানের কর্তব্য এ মা'র শোকর আদায় করা, আদায় করতে প্রস্তুত থাকা। আর যেহেতু আল্লাহ্‌ই মা'কে উক্তরূপে কষ্ট স্বীকার করতে বাধ্য করেছেন এবং মা'র এই স্বীকারের মাধ্যমে তিনি দুনিয়ার মানব বংশের ধারা অব্যাহত রেখেছেন, এ জন্য সব চাইতে বেশী শোকরা করা কর্তব্য মহান আল্লাহ্‌র। এদিক দিয়ে মানুষের উপর যেমন হক্‌ রয়েছে মহান স্রষ্টার, তেমনি হক্‌ রয়েছে মায়ের আর সেই সাথে পিতারও। কেননা পিতা যদি জন্ম দিতে এবং মাতা যদি গর্ভ গ্রহণ, বহন ও প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করতে এবং সর্বশেষে বাচ্চার অক্ষম অবস্থায় সুষ্ঠুভাবে লালন পালন করতে রাযী না হতেন, তাহলে দুনিয়ায় মানুষ পাওয়ার আর কোন উপায়ই ছিল না।

সূরা আল-আহকাফ-এর আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط

وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ

رَبِّ اَوْزِعْنِیْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَالِدَیَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَاِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ـ (الا حقاف - ١٥)

আমরা মানুষকে পথনির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন নিজেদের পিতা-মাতার সহিত নেক আচরণ করে। তার মা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভ ধারণ, বহন ও দুধ পান ত্যাগ করাতে ত্রিশ মাস সময় অতিবাহিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে যখন স্বীয় পূর্ণ শক্তি অর্জন করল, পূর্ণ বয়স্ক হল এবং চল্লিশ বৎসরের হয়ে গেল, তখন সে বললঃ হে আমার রব্ব্ তুমি আমাকে তওফীক দাও, আমি যেন তোমার সেই সব নিয়ামতের শোকর আদায় করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং আমি যেন নেক আমল করি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।

এ দীর্ঘ উদ্ধৃতির আয়াতে পিতা-মাতার ব্যাপারে মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ, সন্তান নিয়ে মায়ের নিরবচ্ছিন্ন কষ্ট স্বীকার এবং সন্তানের পূর্ণ বয়স্কতা লাভের পর আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ—এই তিন পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে পিতা-মাতার প্রতি শুভ আচরণ গ্রহণ করা। পূর্বোদ্ধৃত আয়াতে ঠিক এই একই ভাষায় একই কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে আয়াতে মা'র কষ্টের কথা বলা হয়েছে, এ আয়াতেও তাই। এ আয়াতে বলা কথা হল, মা সন্তানকে কষ্ট করেই গর্ভে ধারণ করেছে, সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা ভোগ করেছে। এরপর দুধ পান করানো সহ একাধারে ত্রিশটি মাস ধরে কষ্ট স্বীকার করেছে। পূর্বের আয়াতে প্রসব-যন্ত্রণা ভোগের কথা বলা হয়নি; কিন্তু দুই বৎসর কাল ধরে দুধ খাওয়ানোকালীন দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে।

এই সন্তান পিতা-মাতা কর্তৃক লালিত হয়ে বড় ও পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর তার কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে অনেকটা বিস্তারিতভাবে। সে কর্তব্য হল, তার প্রতি ও পিতা-মাতার প্রতি আল্লাহ্ যে নিয়ামত দিয়েছেন তার শোকর আদায়ের এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উদ্রেক নেককারী আমল করার তওফীক স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিকট চাওয়া। এখানেই সেই দোয়া শেষ হয়ে যায়নি, সে তার নিজের সন্তানদের কল্যাণ চেয়েছে, আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করেছে এবং নিজে মুসলিম অনুগত বান্দা হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

বস্তুত এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নেক বান্দার আদর্শ ও রীতি-নীতি। সে শুধু নিজের পিতা-মাতার খেদমত করে, তাদের জন্য রহমতের দোয়া করে এবং নিজের জন্য নেক আমলের তওফীক চেয়েই ক্ষান্ত হতে পারে না। সে অনুরূপভাবে নিজের সন্তানের কল্যাণও কামনা করবে আল্লাহ্‌র নিকট। অন্যথায় তার মুসলিম হওয়ার দায়িত্ব পালিত হতে পারে না। এই হচ্ছে মুসলিম সমাজের পারিবারিক ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা। এক সাথে তিন পুরুষের আদর্শের অভিব্যক্তি। এই ধারাবাহিকতাই মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য।

পিতা-মাতা কেবল নিজেদের জীবদ্দশাতেই সন্তানের সঠিক কল্যাণের ব্যবস্থা করে না, মরে যাওয়ার সময়ও সন্তানের জন কল্যাণ রেখে যায়। কেননা পিতা-মাতা নিজেদের জীবদ্দশায় যে ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি উদ্বৃত্ত করে রাখে, মৃত্যুর সময় তা সন্তানের প্রভুত কল্যাণের মাধ্যম বানিয়ে রেখে যায়, সেইজন্য আল্লাহ্‌ পিতা-মাতার রেখে যাওয়া ধন-সম্পদ-সম্পত্তিকে সন্তানের মীরাস ঘোষণা করেছেন। বলেছেনঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا -

(النساء - ٧)

পুরুষ সন্তানের জন্য পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তিতে সুনির্দিষ্ট অংশ রয়েছে এবং কন্যা সন্তানের জন্যও পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ - (النساء - ٣٣)

পিতা-মাতা যে সম্পদ-সম্পত্তি রেখে যায়, আমরা তার প্রত্যেকটির হক্‌দার নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।

আল্লাহ্‌ এহেন পিতা-মাতার হক্‌ সন্তানের উপর ধার্য করেছেন, এই পিতা মাতার প্রতি সন্তানের বিরাট কর্তব্যের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সন্তানের অত্যন্ত বড় কর্তব্য হচ্ছে পিতা-মাতার হক্‌ আদায় করা।

বার্ধক্যে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার আচরণ যাই হোক, সন্তানের নিকট ভাল আচরণ পাওয়ার অধিকার কখনই-ক্ষুণ্ন হতে পারে না। এ পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا - (لقمٰن -١٥)

কিন্তু পিতা-মাতা যদি তোমার উপর আমার সাথে শিরক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয় তোমার কিছুই জানা নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভাল আচার-আচরণ ও সংস্পর্শ গ্রহণের কাজ অবশ্যই করতে থাকবে।

পিতা-মাতা সন্তানের নিকট সর্বাবস্থায়ই সম্মানার্হ ভাল আচার-আচরণ পাওয়ার অধিকারী, একথা সকল শোবা-সন্দেহ বা আপত্তি-বিতর্কের উর্ধ্বে। কিন্তু মানুষের দাসত্ব আনুগত্য পাওয়ার নিরংকুশ অধিকার যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্‌র, তাই তারা যদি সেই এক, একক ও অনন্য আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে, তাহলে সে চাপের নিকট কিছুতেই মাথা নত করা যাবে না। এই ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করার কোন অবকাশই নেই। কিন্তু তাই বলে তাদের সাথে কোনরূপ খারাপ ব্যবহার করবে—এ অধিকারও সন্তানদের থাকতে পারে না। পিতা-মাতা সন্তানকে শিরক করার জন্য—নিরংকুশভাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা থেকে যদি বিরত রাখতে চায়, তা হলে তা কিছুতেই গ্রাহ্য করা যাবে না, কেননা শিরক সর্বতোভাবে ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, জঘন্য ও বীভৎস এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা। পিতা-মাতার এই অযৌক্তিক চাপ আগ্রাহ্য করতে হবে। কিন্তু তারা মুশরিক হলেও তাদের সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করা যাবে না, তাদের ভাল-মন্দ বলা যাবেনা, সন্তানের উপর তাদের যে মানবিক অধিকার রয়েছে তা অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা যাবে না। বরং শুভ আচার ব্যবহার ও খেদমত সেবা পাওয়ার তাদের যে অধিকার রয়েছে, তা অবশ্যই পালন করতে হবে, তারা অমুসলিম হলেও।

উদ্ধৃত আয়াত এবং সূরা আল-আনকাবুত-এর ৮ আয়াত নাযিল হয়েছিল হযরত সাদ ইবন আবূ আব্বাস (রা) প্রসঙ্গে। তিনি ইসলাম কবুল করলে তাঁর মা মুশরিক কাফির থাকা অবস্থায় পুত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে কিরা করে বসলো এবং বললঃ সাদ তার নতুন দ্বীন ত্যাগ করে পুরাতন শিরক ও কুফরীর দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে পানাহার করবে না। পুত্র সাদ (রা) বললেনঃ 'মা তুমি খাও আর না-ই খাও, তুমি বাঁচ আর মরো আমি কিছুতেই তওহীদী দ্বীন ত্যাগ করে পুনরায় শিরক ও কুফরীর দ্বীনে ফিরে যাব না।

কুরআনের উক্ত উভয় আয়াতের মূল প্রসঙ্গে তাই তা এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ থেকে জানা গেল যে, পিতা-মাতা যেই হোক এবং কাফির

মুশরিক হোক, কি ঈমানদার, সন্তানের নিকট ভাল আচার-আচরণ পাওয়ার অধিকার তাদের থাকবেই এবং সন্তানরা সে অধিকার আদায় করতে অবশ্যই বাধ্য।

হাদীসে পিতামাতার হক্‌

কুরআনের আয়াতে সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক্‌-এর কথা মোটামুটিভাবে বলা হয়েছে। দু'তিনটি আয়াতে সন্তানের জন্য মা'র বেশী কষ্ট ভোগের উল্লেখ করে পিতার তুলনায় মা'র হক্‌ অধিক হওয়ার কথা স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। রাসূলে করীম (স)-এর উপর কুরআনের মৌখিক ও বাস্তব ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব অর্পিত বিধায় রাসূলের হাদীসে এই পর্যায়ে অনেক জরুরী কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই এখানে হাদীসভিত্তিক আলোচনা পেশ করা যাচ্ছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِیْ -

হে রাসূল! লোকদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি আমার উত্তম সংস্পর্শ ও আচার-ব্যবহার লাভ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী অধিকারী?

জবাবে তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞেস করলঃ তারপরে কার অধিকার বেশী? রাসূল বললেনঃ তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলে এবারেও বললেনঃ তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞেস করলঃ তারপর কে? তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার পিতা। (বুখারী, মুসলিম)

এ কথায় কোনই সন্দেহ নেই, পিতা-মাতার মধ্যে মা-ই সন্তানের নিকট থেকে ভাল আচার-আচরণ পাওয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রবর্তী এবং তা এইজন্য যে, সন্তানকে দীর্ঘদিন গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব, দুগ্ধ দান ও লালন-পালন করে বড় করে তোলার ব্যাপারে মাকেই অধিক কষ্ট স্বীকার করতে হয়, পিতাকে তা করতে হয় না। একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সন্তানের প্রতি মায়া, দরদ ও টান পিতার তুলনায় মা'র মনে অধিক তীব্র ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ হয়ে থাকে। সম্ভবত মা সন্তানের জন্য কঠিন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে, এমন কি প্রয়োজন হলে জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

মা যদি তাকে গর্ভে বহন করতে ও প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করতে রাযী না হত কিংবা গর্ভে থাকা অবস্থায়ই তাকে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করত, তাহলে সন্তানের

পক্ষে ভূমিষ্ট হওয়াই সম্ভব হত না। কিন্তু মা'র মনে গর্ভস্থ সন্তানের মায়া এতই তীব্র হয় যে, নিজের শত কষ্টও তার নিকট সামান্য মনে হয়। ফলে সন্তানের মায়ায় পড়ে সর্বপ্রকারের কষ্ট অনায়াসেই ভোগ করে যায় বরং সত্যি কথা হচ্ছে, সে কষ্ট মার নিকট কষ্ট মনে হয় না। তার মনে এ ভয়ও জেগে উঠতে পারে যে, সন্তান প্রসবকালে তাকে মৃত্যুও বরণ করতে হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার একবিন্দু পরোয়া না করে সন্তানের কল্যাণের দিকেই বেশী লক্ষ্য দেয়। বত্রিশ নাড়ি দিয়ে তাকে ধারণ করে রাখে, নিজের রক্ত সিঞ্চন করে সন্তানকে ক্রমশ বড় করে তোলে। নিজের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার চাইতেও অনেক বেশী চিন্তাক্লিষ্ট হয় গর্ভস্থ নিজ সন্তানের ক্রমে বেড়ে উঠার জন্য।

মার এই কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। প্রসব-যন্ত্রণা ও সন্তান জন্মদানের কষ্টের মাত্রা এত বেশী যে, বিশ্বের চিকিৎসাবিদ্‌রা অকপটে ও একবাক্যে বলেছেন যে, এইরূপ বা এর একশত ভাগের এক ভাগ কষ্টও যদি পিতাকে স্বীকার করতে হতো তাহলে সন্তান জন্মদান তো দূরের কথা, কোন পুরুষ বিয়ে করতেই রাজী হতো না।

কিন্তু মহান আল্লাহ্‌ যেহেতু মানব বংশের ধারা অব্যাহত রাখতে চান তাই তিনি কথিত কষ্টের প্রায় সমস্ত বোঝা স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মধ্যে এমন একজনের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, যার সহ্যশক্তি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী, যাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মানব বংশের ধারা অব্যাহত রাখার মাধ্যম হওয়ার জন্য। আর এই কারণেই আল্লাহ্‌ তার অবয়বের মধ্যে যেমন গর্ভ ধারণের সমস্ত সরঞ্জাম জন্ম মুহূর্তেই সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তেমনি তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন সেসব গুণ, যা গর্ভ ধারণ, প্রসব-যন্ত্রণা ও লালন-পালনের দুঃসহ কষ্ট সহ্য করার জন্য একান্তই অপরিহার্য।

একান্তভাবে মা'র কষ্টের এই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতা উভয়ের দায়িত্ব প্রায় সমান হয়ে উঠে। বিশেষ করে সন্তানকে সুশিক্ষাদান ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে পিতা-মাতা উভয়কেই সচেতনভাবে চেষ্টা চালাতে হয়। তাই পিতা-মাতা উভয়েরই হক্‌ সন্তানের উপর বর্তে। এ পর্যায়ের কতিপয় হাদীসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন সন্তানের জিহাদে যাওয়ার তুলনায় পিতা-মাতার খেদমতে লেগে থাকাই অধিক শ্রেয় বলে ঘোষণা পাওয়া গেছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ احى والداك তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত? লোকটি বললেনঃ 'হ্যা' তখন রাসূল (স)

বললেনঃ ففيما فجاهد তাহলে তুমি তাদের দু'জনের খেদমতে লেগে থেকেই জিহাদের দায়িত্ব পালন করতে থাক। (মুসলিম)

এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে, পিতা-মাতার খেদমত জিহাদে যাওয়া অপেক্ষা অধিক গুরুত্বের অধিকারী। কেননা জিহাদের যাওয়ার জন্য তো আরও অনেক লোক রয়েছে। কিন্তু তার পিতা-মাতার খেদমতের জন্য সে ছাড়া অন্য কেউ নেই। এক্ষণে পিতা-মাতার খেদমত ত্যাগ করে সে যদি জিহাদে চলে যায়, তাহলে পিতা-মাতার হক্ বিনষ্ট হয়।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেছেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এসে বললেনঃ

أُبَا يِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ اَبْتَغِى الْاَ جِرَمِنَ اللّٰهِ-

আমি আপনার হাতে বায়'আত করছি হিজরত ও জিহাদ করার জন্য। আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে বড় সওয়াব লাভ করতে চাই।

রাসূলে করীম (স) একথা শুনে প্রশ্ন করলেনঃ

هَلْ مِنْ وَّالِدَ يْكَ اَحَدٌ حَىٌّ -

তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কোন একজনওকি বেঁচে আছেন? লোকটি বললেনঃ হ্যাঁ, উভয়ই বেঁচে আছেন।

তখন রাসূল (স) বললেনঃ তুমি তো আল্লাহ্‌র নিকট থেকে বড় বেশী শুভ কর্মফল পেতে চাইছ? তাহলেঃ

اِرْجِعْ اِلَى وَالِدَيْكَ فَاَحْسَنِ صُحْبَتَهُمَا -

তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং তাদের দুজনের সাথে উত্তম সম্পর্ক রক্ষা করে চলো।

একথার তাৎপর্য হলো পিতা-মাতা বর্তমান থাকতে এবং সন্তানের খেদমত ও খোরাক-পোশাক যোগানের মুখাপেক্ষী হলে তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এবং তাদেরকে অসহায় করে ফেলে রেখে জিহাদে যাওয়াও রাসূলের নিকট সমর্থিত হয়নি। অথচ ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব যে কত বেশী, তা কারোই অজানা নেই। এ থেকেই স্পষ্ট হয় যে, জিহাদে শরীক হওয়ার তুলনায়ও পিতা-মাতার খেদমত অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পিতা-মাতার খেদমত ও প্রয়োজন পূরণ যদিও নেহায়েত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপার, আর জিহাদ হচ্ছে সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপার। এ দৃষ্টিতে পিতা-মাতার খেদমতের তুলনায় জিহাদ অধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত বলে বাহ্যত মনে হলেও, ইসলাম যেহেতু ব্যক্তি ও পরিবারের সমন্বয়েই সমষ্টি ও রাষ্ট্র গড়ে উঠে, তাই এ ক্ষেত্রে সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের তুলনায় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপার—পিতা-মাতার খেদমত জিহাদের অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব পেয়ে গেছে। বস্তুত যেখানে ব্যক্তি ও পরিবার উপেক্ষিত, সেখানে সামষ্টিক রাষ্ট্রীয় প্রসাদও ধুলিসাৎ হয়ে যেতে বাধ্য। ইসলামী সমাজ বিধানের এই বৈশিষ্ট্য তুলনাহীন, দৃষ্টান্তহীন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (স) বললেনঃ

তার অকল্যাণ হোক, তার ধ্বংস হোক, সে নিপাত যাক। একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে রাসূল, আপনি কার কথা বলছেন? জবাবে বললেনঃ

مَنْ اَدْرَكَ اَبْوَيْهِ عِنْدَهُ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ-

আমি বলছি তার কথা, যে তার পিতা-মাতার একজন বা উভয়জনকেই বার্ধক্যাবস্থায় পেল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না।

অত্যন্ত সাংঘাতিক কথা! পিতা-মাতাকে বার্ধক্যাবস্থায় পেয়েও জান্নাতে যেতে না পারার একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, সে পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করেনি, তাদের খেদমত প্রয়োজন পূরণ করেনি। আর এ এমন একটি অপরাধ, যার দরুন শত নেক আমল থাকা সত্ত্বেও সে জান্নাতে যেতে পারবে না। আর এই কারণে কারোর জান্নাতে যেতে না পারা বড়ই দুঃখজনক। তার তো অকল্যাণ ও ধ্বংস অনিবার্য এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক। বৃদ্ধাবস্থায় পিতা-মাতার খেদমত করা হলে বেহেশ্‌ত পাওয়া অবধারিত। আর তা না করলে বেহেশতে যেতে না পারা বরং জাহান্নামে যাওয়া নিশ্চিত। রাসূলে করীম (স)-এর উপরোক্ত কথার এটাই তাৎপর্য।

পিতা-মাতার খেদমতের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আনুগত্য ও হুকুম পালনও একান্তই জরুরী। তবে শর্ত হচ্ছে সে হুকুম আল্লাহ্ ও রাসূলেব তথা শরীয়াতের হুকুমের বরখেলাপ হবে না। এমনকি কোন শরীয়াতী কারণে পিতা-মাতা যদি

প্রিয়তমা স্ত্রীকেও ত্যাগ করতে বলে, তবে তাও পালন করতে হবে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ইঙ্গিতমূলক কথা বুঝতে পেরেই মক্কায় বসবাসকারী হযরত ইসমাঈল (আ) তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন এবং তা করে পিতার আদেশ পালনের তুলনাহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি পিতার নিকট যখনই শুনলেন যে, আল্লাহ্‌ চান, ইসমাঈল আল্লাহ্‌র জন্য যবাই হয়ে যাক, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রাযী হয়ে গেলেন। বললেনঃ

يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْشَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ –

হে আব্বাজান! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে, তা আপনি পালন করুন। আপনি আমাকে অবশ্যই একজন ধৈর্যশীল পাবেন।

হযরত উমর (রা) তাঁর পুত্র সাহাবী আবদুল্লাহ্‌কে স্ত্রী তালাক দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন, তিনি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে তাঁর পিতার আদেশ মানার জন্যই কেবল তালাক দিয়ে দিলেন। অথচ তিনি নিজে তাঁর এই স্ত্রীকে ত্যাগ করার কথা কখনও ভাবতে পারেন নি।

মনে রাখা আবশ্যক, মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে তাদের মধ্যে বালকের মেজাজ-প্রকৃতি প্রবল হয়ে দেখা দেয়। শিশু ও বালক যেমন বয়স্ক অধিক স্নেহভাজন পিতা-মাতার লালন-পালন ছাড়া বাঁচতে ও বড় হতে পারে না, বৃদ্ধ পিতা-মাতাও তেমনি সন্তানের দরদপূর্ণ সেবা না পেলে বাঁচতে পারে না। বৃদ্ধ পিতা-মাতাও এই বার্ধক্যাবস্থায় স্নেহময় সন্তানেরই দরদপূর্ণ সেবাযত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। সন্তানের পক্ষেই সম্ভব বৃদ্ধ অক্ষম পিতা-মাতার মনস্তত্ত্ব রক্ষা করে তাদের যথার্থ সেবা যত্ন করা। সন্তানরাই সঠিকভাবে বুঝতে পারে পিতা-মাতা কিসে সন্তুষ্ট হবে। এভাবে সন্তান যখন পিতা-মাতার খেদমত করে তাদের মনকে সন্তুষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়, তখন তাদের মন ও মুখে সন্তানদের জন্য আন্তরিক দোয়া জেগে উঠে। সেই দোয়া আল্লাহ্‌র নিকট অবশ্যই কবুল হয়ে যায়। বুখারী শরীফে একটি দীর্ঘ হাদীসে পিতা-মাতার খেদমতকে একটি রূপক দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানো হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির সময় হঠাৎ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল কতিপয় ব্যক্তি। আর হঠাৎ করে এক প্রস্তরখণ্ড এসে সে গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। তখন গুহার অভ্যন্তর থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার কোন উপায় না দেখে প্রত্যেকেই নিজ নিজ একনিষ্ঠ নেক আমলের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌র নিকট মুক্তি চেয়ে কান্নাকাটি করতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা পিতা-মাতার একনিষ্ঠ খেদমত করার কথা বলেছিল। দেখা গেল প্রস্তরখণ্ড সরে গেছে এবং গুহার মুখ খুলে গেছে।

রাসূলের হাদীস অনুযায়ী কেবল পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করলেই সন্তানের দায়িত্ব পুরাপুরি পালন হয়ে যায় না। পিতার নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও ভাল ব্যবহার করা কর্তব্য। রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ –

পিতার বন্ধু ভালবাসার লোকদের সাথে শুভ আচার-আচরণ করা সন্তানের জন্য অনেক বেশী ভাল কাজ।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর একটি গাধা ছিল। তাতে সওয়ার হয়ে তিনি বাইরে চলাফেরা করতেন। আর তখন তাঁর মাথায় একটি পাগড়ী থাকত। একদা তিনি বাইরে বের হয়ে চলে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি আরব বেদুঈনকে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি অমুকের পুত্র অমুক নও? সে বললঃ হ্যাঁ। তখন তিনি গাধাটি তাকে দিলেন। বললেন, তুমি এটাতে সওয়ার হও। সেই সাথে মাথার পাগড়ীটিও দিলেন। বললেনঃ এ দিয়ে মাথা শক্ত করে বেধে নাও।

এ দেখে তাঁর সঙ্গীরা বলে উঠলঃ আল্লাহ্ আপনার গুনাহ্ মাফ করুন। আপনি নিজে যে গাধাটিতে সওয়ার হয়ে চলতেন, সেটি এই লোকটিকে দিয়ে দিলেন। আর যে পাগড়ীটি আপনি নিজের মাথায় বাঁধতেন, সেটিও দিলেন। তখন হযতর আবদুল্লাহ্ (রা) বললেনঃ আমি শুনেছি, রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ পিতার বন্ধুর সাথে ভাল ব্যবহার করা সন্তানের জন্য অতীব উত্তম কাজ। হাদীসটির বর্ণনাকারী বলেছেনঃ সেই বেদুঈনের পিতার সাথে হযরত আবদুল্লাহ্‌র পিতা হযরত উমর (রা)-এর বন্ধুত্ব ছিল। সেই কারণে তিনি এইরূপ করেছিলেন। পিতার বন্ধুর হক রয়েছে বন্ধু-পুত্রের নিকট ভাল ব্যবহার পাওয়ার (মুসলিম)

পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক্

সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক যেমন কুরআন-হাদীস থেকে প্রমাণিত, তেমনি পিতা-মাতার উপর সন্তানের হকও অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। পিতা-মাতা ছাড়া যেমন সন্তানের কথা চিন্তা করা যায় না, তেমনি পিতা-মাতার কথা উঠলে স্বাভাবিকভাবে সন্তানের কথা সম্মুখে ভেসে উঠবে। তাই সন্তানের উপর যেমন পিতা-মাতার হক্ রয়েছে, তেমনি সন্তানেরও হক্ রয়েছে পিতামাতার উপর। অন্য কথায়, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার বিরাট কর্তব্য রয়েছে।

বস্তুত সন্তান সেই মুহূর্ত থেকেই পিতা-মাতার সন্তান, যে মুহূর্ত পিতার শুক্রকীট তার দেহ থেকে নির্গত হয়ে মা'র জরায়ুতে স্থান লাভ করতে তীব্র গতিতে ধাবমান হয় এবং মা'র জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করার সাথে সাথে জরায়ুর মুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং সে কীট রক্ত ও মাংসের স্তর অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গয়ব একটি সত্তার রূপ লাভ করতে থাকে। এই সময়টা মা'র জন্য যেমন, গর্ভস্থ সন্তানের জন্যও একই রকমের সংকটকাল। এ সময়ে সন্তানের প্রতি মা'র কর্তব্য সন্তানের সুষ্ঠু ও পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ। সন্তান চায়, সে যেন মাতৃগর্ভে পূর্ণ সংরক্ষণ লাভ করে, তার অস্তিত্ব যেন কোন ভাবেই বিপন্ন না হয়, যেন ভূমিষ্ট হয়ে দুনিয়ার জীবন লাভ করতে পারে। সেই সময় পিতার কর্তব্য, মা'র সেবা যত্ন করা। সন্তান ধারণজনিত দায়িত্ব পালনে মা'র সাথে পূর্ণ আনুকূল্য ও সহযোগিতা করা। সন্তান প্রসবকালীন কষ্ট ভোগ করা কালে মা'র যাবতীয় প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ করা। মা যেন সন্তানকে স্তন্য দান ও সুষ্ঠুভাবে লালন-পালন করতে পারে, সেদিন সতর্ক নজর রাখা। এক কথায় গর্ভধারণকাল থেকে ভূমিষ্ট হওয়া ও তার লালন-পালন চলাকাল পর্যন্ত সন্তানের পূর্ণাঙ্গ দেহ গঠনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা পিতা ও মাতা—উভয়ের কর্তব্য। এই সময় তাদের এমন কোন কাজ না করা কর্তব্য, যাতে সন্তানের দৈহিক, মানসিক বা নৈতিক ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে।

নিতান্ত অবাঞ্ছিত হলেও পিতামাতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে পিতার কর্তব্য সন্তানের দুধ পানের ব্যবস্থা করা। সে জন্য নগদ মজুরী দিয়েও যদি তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবুও পিতা-মাতাকেই করতে হবে। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার এই কর্তব্য পুত্র সন্তানের পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের বিবাহ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

সন্তানের নৈতিক আদর্শ শিক্ষাদান সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ –

যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানদেরও আমরা তাদের সাথে (জান্নাতে) একত্রিত করব।

অতএব পরকালে জান্নাতে সন্তানদের সাথে একত্রিত জীবন যাপনের লক্ষ্যে এই দুনিয়ায় সন্তানদের ঈমানদার ও নেক আমলকারী বানানোর জন্য চেষ্টা করা পিতা-মাতা—উভয়েরই কর্তব্য। সূরা আর-রায়াদ-এ বলা হয়েছেঃ

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ -

সদাপ্রস্তুত জান্নাতে তারা প্রবেশ করবে, আর তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা নেক্কার হবে তারাও।

(সূরা আর-রায়াদঃ ২৩)

ফেরেশতাগণ দোয়া করে এই বলেঃ

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ نِ الَّتِىْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ -

হে আমাদের রব, তুমি ওদেরকে সদা প্রস্তুত জান্নাতে দাখিল কর যার ওয়াদা তুমি তাদেরকে দিয়েছ। আর তাদেরকেও যারা তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে থেকে নেককার হবে।

আল্লাহ নিজেই যখন নেককার সন্তানদেরকে জান্নাতী পিতা-মাতার সাথে পরকালে একত্রে বসবাস করার ওয়াদা করেছেন, তখন সন্তানদেরকে নেককার বানানোর জন্য চেষ্টা করা পিতা-মাতার প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অন্যথায় পরকালে আল্লাহ্‌র এ ওয়াদা পূরণ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হবে না।

রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

كَمَا اَنَّ لِوَالِدَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا كَذٰلِكَ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا-

যেমন করে তোমার পিতা-মাতার হক্ রয়েছে তোমার উপর, তেমনি তোমার সন্তানেরও হক্ রয়েছে তোমাদের উপর। (তাবরানী, দারে কুতনী)

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক্ রয়েছে, সন্তানের প্রতি বড় কর্তব্য রয়েছে পিতা-মাতার। এই জন্যই নবী করীম (স) সন্তানের প্রতি শুভ আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ

رَحِمَ اللّٰهُ وَالِدًا اَعَانَ وَلَدَهُ عَلٰى بِرِّهٖ -

আল্লাহ্ এমন পিতার প্রতি রহমত করেন, যে নেক কাজে নিজের সন্তানের সাহায্য করে। অর্থাৎ সন্তানকে সৎ, চরিত্রবান ও আল্লাহর নেক বান্দা

বানানোর জন্য চেষ্টা করা পিতা-মাতার কর্তব্য। যে এই কর্তব্য পালন করে, তার প্রতি আল্লাহ্‌ রহমত বর্ষণ করেন।

পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক্‌ আদায় করলে, অন্য কথায় সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য পালনে সমতা রক্ষা করা, তাদের মধ্যে কোনরূপ তারতম্য না করাও পিতা-মাতার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য। এইজন্য রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

سَاؤُوْابَيْنَ اَوْلَادِكُمْ فِى الْعَطِيَّةِ -

দান করার ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করলে, অর্থাৎ সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যে কর্তব্য রয়েছে, তা নিজেদের রুচি ও ইচ্ছামত আদায় করতে পারবে না। বরং এ ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহ্‌র সমতার নীতি পুরাপুরি অনুসরণ করতে হবে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্যের একটি বিস্তারিত তালিকা হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটি এইঃ

اَلْغُلَامُ يُعَقُّ عِنْدَ الْيَوْمِ السَّابِعِ وَيُسَمّٰى وَيَحْلَقُ رَاسُهُ فَاذَا بَلَغَ سِتَّ سِنِيْنَ اُدِّبَ فَاِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِيْنَ عُزِلَ فِرَاشُهُ فَاِذَا بَلَغَ ثَلٰثَ عَشَرَةَ سَنَةً ضَرَبَ عَلَى الصَّلٰوةِ فَاِذَا بَلَغَ سِتَّ عَشَرَةَ سَنَةً زَوَّجَهُ اَبُوْهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهٖ فَقَالَ قَدْ اَدَّبْتُكَ وَعَلَّمْتُكَ وَاَنْكَحْتُكَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَعَذَا بِكَ فِى الْاٰخِرَةِ -

সাতদিন বয়সে ছেলের আকীকা দিতে হবে, নাম রাখতে হবে এবং তার মাথার চুল কামিয়ে দিতে হবে। ছয় বছর বয়সে তাকে শিষ্টাচার শেখাতে হবে, নয় বছরে তার বিছানা পৃথক করে দিতে হবে আর তের বছর বয়সে নামায না পড়লে তাকে প্রহার করতে হবে। ছেলের বয়স যখন ষোল বছর হবে, তখন তার পিতা তাকে বিয়ে করিয়ে দেবে। আর হাত ধরে বলবে, আমি তোমাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছি, লেখা পড়া শিখিয়েছি ও বিয়ে করিয়ে দিয়েছি। দুনিয়ায় তোমার ফেতনা থেকে আর আখেরাতে তোমার আযাব থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

নিকটাত্মীয়দের হক

আল্লাহ্‌ অ'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ- (النساء-١)

এবং তোমরা ভয় কর সেই আল্লাহ্‌কে যাঁর নাম করে তোমরা পরস্পরের নিকট কোন কিছু পেতে চাও এবং (ভয় কর) রেহেম কে।

'রেহেম' শব্দের অর্থ নৈকট্য, নিকটাত্মীয়তা, রক্ত-সম্পর্ক, একই মা'র গর্ভে জন্ম হওয়া। এসব দিক দিয়ে যাদের সাথে নিকটাত্মীয়তা রয়েছে, তাদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তা ছিন্ন করার মর্মান্তিক পরিণতিকে ভয় করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা আদেশ করেছেন এবং তাকে স্বয়ং আল্লাহ্‌কে ভয় করার সমতুল্য করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে তো ভয় করতেই হবে, সেই সাথে নিকটাত্মীয়তা রক্ষা করেও চলতে হবে। নিকটাত্মীয়তা যথাযথভাবে রক্ষা না করা আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নাফরমানী। তা আল্লাহ্‌কে ভয় না করার সমতুল্য অপরাধ।

এই নিকটাত্মীয়দের মধ্যে গণ্য হয় ভাই, বোন, তাদের সন্তান, চাচা, ফুফু ও তাদের সন্তান, মামা ও তাদের সন্তান।

লোকদের মধ্যে 'রেহেম' সম্পর্ক মালার সুতির মত। এই সুতি দিয়ে বিভিন্ন ফুল গেঁথে যেমন একটি মালা রচনা করা হয়, ঠিক তেমনি 'রেহেম' সম্পর্ক বহু সংখ্যক মানুষকে একই সুত্রে গ্রথিত করে, পরস্পরকে পরস্পরের সাথে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করে। ফলে তারা বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয় তারা। এরা হয় একই পরিবারের লোক। প্রত্যেকেই অনুভব করে ও মেনে নেয় যে, অপর প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে তার উপর। আর এই ধরনের বহু সংখ্যক পরিবারের সংযুক্তিতে গড়ে উঠে উম্মাহ। পরিবারে বিভিন্ন লোক যখন পরস্পর সম্পর্কিত ও সংযুক্ত হয়, পরস্পরের প্রয়োজন, অভাব-অনটন ও সুখ-দুঃখের ব্যাপারে তারা সচেতন ও আন্তরিক হয়ে উঠে, তখন তাদের সমন্বয়ে সঠিক পরিবারসমূহের দৃঢ়তার ফলে গোটা উম্মাহ্‌ হয়ে উঠে অত্যন্ত শক্তিশালী। এই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ও পরিবার কোন অবস্থায়ই নিজেকে অসহায় বোধ করে না। প্রত্যেকেরই কল্যাণ আর পরিবারসমূহের কল্যাণে গোটা উম্মার কল্যাণ অবধারিত হয়ে উঠে। উম্মাই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে।

ইসলামে সাধারণভাবেই মানুষের প্রতি কল্যাণ কামনার নির্দেশ রয়েছে যেখানে, সেখানে এই ব্যক্তিগণের, পরিবারসমূহের ও উম্মার বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি

কল্যাণ সাধন অবশ্যই কাম্য হবে—এটাই স্বাভাবিক। অতএব মানুষ মাত্রেরই উচিত এই দায়িত্ব পালনে পূর্ণ সতর্কতার সাথে ব্রতী হওয়া। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ - (بنی اسرائیل - ٢٦)

এবং নিকটাত্মীয়কে তার হক্‌ দাও।

নিকটাত্মীয়ের যে হক্‌ রয়েছে তা নিশ্চিত, অবধারিত, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তা নিয়ে কোন আপত্তি বা বিতর্কের অবকাশ নেই। অতএব সে হক্‌ তোমরা যথাযথ আদায় কর। তা আদায় করতে কোনরূপ টাল-বাহানা করবে না। ইরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى - (النحل - ٩٠)

আল্লাহ্‌ নিশ্চিতভাবে আদেশ করেছেন সুবিচার, ন্যায়পরতা ও কল্যাণময় ব্যবহার করার এবং নিকটাত্মীয়ের হক্‌ দিয়ে দেয়ার জন্য।

আয়াত থেকে বোঝা যায়, নিকটাত্মীয়ের হক্‌ দিয়ে দেয়া ন্যায়পরতা ও সুবিচারের কাজ এবং তাতেই কল্যাণ নিহিত। তা না দিলে অবিচার হবে, জুলুম হবে এবং হবে নিতান্তই নির্যাতন ও অধিকার হরণের ন্যায় কঠিন অন্যায়।

নিকটাত্মীয়দের পরস্পরে যে সম্পর্ক, তা আল্লাহ্‌রই স্থাপিত এবং তা স্বয়ং আল্লাহ্‌রই ওয়াদা ও চুক্তি বিশেষ। আল্লাহ্‌র সে ওয়াদা ও চুক্তি অবশ্যই সংরক্ষিত হতে হবে। তা সংরক্ষিত না করা হলে আল্লাহ্‌র বিধানকেই লংঘন করা হবে। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ - اُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ - (الرعد - ٢٥)

আল্লাহ্‌র ওয়াদা ও চুক্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হওয়ার পর যারা তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্‌ যা মিলিয়ে রাখার আদেশ করেছেন তা ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় এবং পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, তাদের জন্য অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ পরিণতি।

নিকটাত্মীয়দের পারস্পরিক সম্পর্ক সংরক্ষণের আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্‌ এবং তা-ই তাঁর চুক্তি ও ওয়াদা। তা ভঙ্গ করা এবং নিকটাত্মীয়দের হক্‌ আদায়

না করা কঠিন বিপর্যয়ের নিশ্চিত কারণ। এই বিপর্যয়ের দুটি পরিণতিঃ ইহকালে এবং পরকালে। ইহকালে হবে লা'নত। 'লা'নত' অর্থ, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। আর আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে পড়ার মত দুর্ভাগ্য আর কিছুই নেই। আর পরকালে তো জাহান্নাম অনিবার্য হয়ে পড়বে। অপর আয়াতে এর বিপরীত ইতিবাচক কথা বলেছেন এই ভাষায়ঃ

اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ - وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَاللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ -

(الرعد - ٢٠ - ٢١)

প্রকৃত বুদ্ধিমান তারা, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত চুক্তি পূরণ করে, দৃঢ় চুক্তি ভঙ্গ করে না এবং যারা আল্লাহ্ যা মিলিয়ে রাখতে বলেছেন তা মিলিয়ে রাখে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে, ভয় করে খারাপ হিসাব-নিকাশ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ আল্লাহ্ যখন সৃষ্টিকর্ম সম্পূর্ণ করেছেন, তখন 'রেহেম' দাঁড়িয়ে গেল। বললঃ হে আল্লাহ্, 'রেহেম' ছিন্ন করা থেকে পানাহ চাওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। আল্লাহ্ বললেনঃ হ্যাঁ, তুমি কি খুশী হবে না আমি যদি সম্পর্ক রক্ষা করি তার সাথে, যে তোমার সম্পর্ককে অবিচ্ছিন্ন রাখবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করি তার সাথে, যে তোমার সম্পর্ককে ছিন্ন করবে, তা হলে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে? হে আল্লাহ্! আল্লাহ্ বললেন, তবে তাই হবে। (বুখারী, মুসলিম)

অন্য কথায়, নিকটাত্মীয়ের হক্ আদায় করা ও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার উপায় এবং নিকটাত্মীয়দের হক্ আদায় না করা—সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। ..... কোন ঈমানদার ব্যক্তিই কি তা চাইতে পারে?

সূরা আল-বাকারার ১৭৭ আয়াতটিতে সর্বোত্তম নেক আমলের পথ প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى -

(البقر - ١٧٧)

বরং প্রকৃত কল্যাণময় আমলের পথ হচ্ছে তার, যে আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতা, নাযিল হওয়া কিতাব ও নবীগণের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তারই মুহব্বতে নিকটাত্মীয়দের আর্থিক সাহায্য দিয়েছে।

তারই মুহব্বত বা ভালবাসায় আর্থিক সাহায্য দিয়েছে অতবা তার অর্থ, ধন-মালের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়দের আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। ধন-মালের প্রতি মানুষের যে স্বভাবগত টান বা ভালবাসা থাকে, মানুষ সাধারণত তা ব্যয় করতে প্রস্তুত হয় না। কিন্তু ঈমানদান ব্যক্তির মনে আল্লাহ্র ভালবাসা অধিক প্রবল হয়ে থাকে বলে ধনমালের মায়ার মুকাবিলায় আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা বিজয়ী হয়ে যায়। আল্লাহ্ ভালবাসার দাবি রক্ষার জন্য ধন-মালের ভালবাসা ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না এবং নিকটাত্মীয়দের অভাব-অনটন বা বিপদকালে তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। নিকটাত্মীয়দের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্যবোধ অধিক প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে উদ্বৃত হয়েছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

اَلرَّحْمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ - مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ-

'রেহেম' নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহ্র আরশ-এর সাথে ঝুলে থেকে বলতে থাকেঃ যে লোক আমাকে রক্ষা করল, আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবেন। আর যে লোক আমাকে ছিন্ন করল, আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। (বুখারী, মুসলিম)

সাদকা বা দান পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

وَعَلٰى ذِى الرَّحْمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ -

নিকটাত্মীয়কে অর্থ দান করা হলে এক সঙ্গে দুটি কাজ হয়। একটি হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং দ্বিতীয় হইল দান।

এ হাদীস এবং অন্যান্য হাদীসের দৃষ্টিতে অভাবগ্রস্ত নিকটাত্মীয়দের দান করাই ব্যক্তির সর্বপ্রথম কর্তব্য। অভাবগ্রস্ত নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে দূরবর্তী লোকদেরকে দান করা আল্লাহ্র নিকট কিছু মাত্র পছন্দনীয় নয়। কেননা তাতে 'রেহেম' কর্তন করা হয়। আর ইরশাদ করেছেনঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ -

'রেহেম' সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক

নিকটাত্মীয়দের পারস্পরিক হক্ বা অধিকার পর্যায়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার। কেননা স্বামীর জন্য স্ত্রী এবং স্ত্রীর জন্য স্বামী অন্যদের তুলনায় সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয়। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক আত্মিক সম্পর্ক একান্তই অনিবার্য। কেননা আল্লাহ্র মানুষ সৃষ্টির একমাত্র পবিত্র মাধ্যম হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী। একজন পুরুষ যখন শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ্ করে নিজের স্ত্রী বানায় এবং একজন স্ত্রীলোক যখন অনুরূপ পন্থায় একজন ভিন পুরুষকে নিজের স্বামীরূপে গ্রহণ করে ও অতঃপর একত্রে জীবন যাপন শুরু করে, তখন একটি পরিবারের সৃষ্টি হয়। এই পরিবারটি একান্তভাবে স্বামী-স্ত্রী সমন্বিত। উভয়ের মিল-মিশ, যৌনমিলন ও একত্র জীবন যাপনই এই পরিবারটির স্থিতি স্থাপন করে। এখানেই আসে আল্লাহ্র সৃষ্টি মানব শিশু।

সুস্থ সুন্দর মানব শিশু জন্মানোর জন্য স্বামী-স্ত্রী সমন্বিত পরিবারের অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও মাধুর্য একান্তই জরুরী। অন্যথায় মানব শিশুর জন্ম সম্ভব হয় না, হলেও তারা শিশুকালীন একান্ত প্রয়োজনীয় আদর-যত্ন স্নেহ ও সঠিক লালন-পালন থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। ফলে তারা প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু তা আল্লাহ্র কাম্য নয়।

আর পারিবারিক জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুস্থতা মাধুর্যের জন্য একান্তই আবশ্যক স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার যথাযথ আদায় হওয়া। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার আদায় করবে, স্ত্রী আদায় করবে স্বামীর অধিকার।

কুরআন মজীদ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন এবং সে বিষয়ে সচেতন করার জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধান দিয়েছেন। কুরআনের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সর্বতোভাবে অভিন্ন ও কোনরূপ তারতম্য করা হয়নি। বলা হয়েছেঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ -- وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - (البقر-- ٢٢٨)

স্ত্রীদের রয়েছে ঠিক ততখানি অধিকার (স্বামীদের উপর), যতখানি রয়েছে তাদের উপর (স্বামীদের)। তবে স্বামীদের একটি অধিক মর্যাদা রয়েছে স্ত্রীদের উপর। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞানী।

স্বামীর হক্‌ স্ত্রীর উপর

প্রথমে স্ত্রীর উপর স্বামীর হক্‌ যাচাই করা আবশ্যক। কেননা মূলত স্বামীকে কেন্দ্র করেই একটি পরিবার গড়ে উঠে। পারিবারিক জীবনের যাবতীয় দায়-দায়িত্বের বোঝা স্বামীকেই বহন করতে হয়। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন।

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْءَةِ اَنْ لاَتَهْجَرَ فِرَاشَهُ وَاَنْ تُبِرَّ قَسَمَهُ وَاَنْ تُطِيْعَ اَمْرَهُ وَاَنْ لاَتَخْرُجَ اِلاَّ بِاِذْنِه وَاَنْ لاَ تَدْخِلَ عَلَيْهِ مَنْ يَّكْرَهُ - (الطبرانى)

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক্‌ হচ্ছে, স্ত্রী স্বামীর শয্যাত্যাগ করবে না, তার প্রাপ্য ও দেয়া কসম যথার্থ মর্যাদার সাথে আদায় করবে, তার আদেশ পালন করবে, তার অনুমতি ব্যতীত ঘরের বাইরে যাবে না এবং স্বামী পছন্দ করে না—এমন ব্যক্তিকে কখনই ঘরে প্রবেশ করতে দেবে না।

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি হাদীসের ভাষা হচ্ছেঃ

لاَيَحِلُّ لِامْرَاَةٍ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِه وَلاَ تَاْذَنَ فِىْ بَيْتِه اِلاَّ بِاِذْنِه -

স্বামী ঘরে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না এবং তার অনুমতি ছাড়া কাউকে তার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতিও দেবে না।

তিরমিযী ও নাসায়ী গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি হাদীস হচ্ছে—রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

اِذَادَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِه فَلْتَاْتِه وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ -

স্বামী যখন নিজের প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকবে, তখন স্ত্রী যেন অবশ্যই তার নিকট উপস্থিত হয়, সে যদি রান্না-বান্নার কাজে চুলার নিকটও ব্যস্ত থাকে—তবুও।

হাদীসে যে প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে তা দু'রকমের হতে পারেঃ যৌন প্রয়োজন এবং বৈষয়িক কাজ-কর্মের প্রয়োজন। ঘরের রান্না-বান্নার কাজটি প্রধানত ও সাধারণত স্ত্রীকেই করতে হবে। হাদীসের ভাষা থেকে এ দুটি কথা স্পষ্ট। এ কথাও স্পষ্ট যে, স্ত্রী স্বামীর গোপন তত্ত্ব ও ধন-মালের পূর্ণ সংরক্ষণ করবে। এজন্য কুরআনে স্বামীদের প্রতি আদেশ ঘোষিত হয়েছেঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

এবং স্ত্রীদের সাথে সাংসারিক জীবন যাপন কর অতি উত্তমভাবে।

স্ত্রীর হক্‌ স্বামীর উপর

আর স্ত্রীর উপর স্বামীর একটি উচ্চ মর্যাদা থাকার যে কথা কুরআনের উপরোদ্ধৃত আয়াতে বলা হয়েছে, তা এইজন্য যে, স্বামী স্ত্রীকে মোহরানা দেবে, তার যাবতীয় জৈবিক ও মানবিক প্রয়োজন খাওয়া, পরা, থাকা ইত্যাদি যথাযথভাবে পূরণ করবে, তার সাথে ভাল সৌজন্যপূর্ণ আচার-আচরণ করবে, সার্বিকভাবে তার সংরক্ষণ করবে। তাকে আল্লাহ্‌র শরীয়াত পালনের অভ্যস্ত করবে, নামায-রোযা ইত্যাদি ইসলামী বিধানসমূহ পালন করার শিক্ষাদান করবে, সেজন্য পূর্ণ আনুকূল্য দেবে। ঘর-সংসারের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে স্ত্রীর মতের উপর গুরুত্ব দেবে, তাকে কোন দিক দিয়ে উপেক্ষা করবে না, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। স্বামীর উপর স্ত্রীর এই অধিকারও স্বীকৃত যে, স্বামীর শরীয়াত পরিপন্থী কোন আদেশ পালনে বাধ্য হবে না বা তাকে বাধ্য করা হবে না। স্বামী ইচ্ছানুক্রমে স্ত্রী-সন্তানের খোরপোশ ইত্যাদির প্রয়োজন পূরণ না করলে স্ত্রী স্বামীর ধন-মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণ ব্যয় করতে পারবে স্বামীর অজ্ঞাতসারেই। তবে স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কাউকে কোন উপঢৌকন দিতে পারবে না স্বামীর ধন-মাল থেকে। তবে ইচ্ছা করলে নিজের ধন-মাল থেকে দিতে পারবে। সেজন্য স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন পড়বে না। স্ত্রীর কি অধিকার আছে স্বামীর উপর, এই পর্যায়ের এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

اَنْ تُطْعِمْهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا كْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهُ

وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ - (ابو داؤد-مسند احمد)

তুমি যখন খাবে তখন স্ত্রীকেও খাওয়াবে, তুমি যখন পরবে তখন স্ত্রীরও পরিধেয়ের ব্যবস্থা করবে। তার মুখমণ্ডলের উপর কখনই আঘাত দেবে না, তা বিশ্রী বীভৎস করবে না এবং ঘরের শয্যায় ছাড়া অন্যত্র তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না, ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রাখবে না।

(আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

কুরআন মজীদে অপর এক প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ - (النساء- ١٢٩)

অতএব, তোমরা কোন এক জনের দিকে পুরামাত্রায় ঝুঁকে পড়ে অপরজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রাখবে না।

রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ প্রকৃত ভদ্রলোক সে, যে নিজ স্ত্রীকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়। আর নিকৃষ্টতম ব্যক্তি সে যে তার স্ত্রীকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে।

পাড়া-প্রতিবেশীদের হক্

মানুষ পরিবারকেন্দ্রিক জীবন যাপনে বাধ্য। পরিবারহীন মানব জীবন অকল্পনীয়। বরং তা নিতান্ত পাশবিক জীবনধারা। পশুরা পরিবার-নির্ভর নয়। মানুষের পরিবারও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। একটি পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের নৈকট্য ভিত্তিক সম্পর্ক অনিবার্য। এই নিকটবর্তিতার কারণেই পাড়া-প্রতিবেশীর উদ্ভব হয়। বহু কয়টি পরিবারের পারস্পরিক নিকটবর্তী জীবনই মানুষের সামাজিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। ঘরের পাশে ঘর, বাড়ীর পাশে বাড়ী, একটি পরিবারের পাশে আর একটি পরিবার অবস্থিতির মাধ্যমেই পাড়া বা মহল্লা গড়ে উঠে। আর এভাবে যারা কাছাকাছি বাস করে, তারা পরস্পরের প্রতিবেশী। মানুষের সামাজিক জীবনের অনিবার্যতার পরিণতিতেই হচ্ছে প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এই তত্ত্বটি মানুষকে মানুষ—আল্লাহ্‌র স্বতন্ত্র মর্যাদা সম্পন্ন এক সৃষ্টি হওয়া তত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু মানুষকে যদি পশুর অধঃস্তন ধারণা করা হয়, তাহলে উক্ত তত্ত্বের কোন স্থান থাকে না, মানুষের জীবনে পরিবার ও পাড়া-প্রতিবেশীরও কোন প্রশ্ন উঠে না। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে মানুষকে পশুর বংশধর মনে করা হয় বলে তথায় না পরিবার ও পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব স্বীকৃত, না পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা। সেখানে ব্যক্তির ঘরের প্রাচীরের ওপাশে কে বাস করে, তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হয়ত একটি প্রাচীরের দুই দিকে বসবাসকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন সাক্ষাতও ঘটে না।

কিন্তু ইসলাম তো মানবিক জীবন-বিধান। 'মানুষ' শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থেই রয়েছে অন্য মানুষের প্রতি আন্তরিকতা পোষণ। ফলে একটি পরিবার পরিবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থানকারী মানুষের মধ্যে যেমন পারস্পরিক সহৃদয়তা-মহানুভবতা অত্যন্ত স্বাভাবিক, তেমনি একই পাড়া—মহল্লার অধিবাসীদের মধ্যেও অনুরূপ সহৃদয়তা-আন্তরিকতা গড়ে তোলা মহান আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। এই কারণে মানুষের জন্য তাঁর রচিত বিধানে এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার করার

নির্দেশদানের পরপরই পিতা-মাতা ও নিকটবর্তীদের, পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। সূরা আন-নিসা'র আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْابِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِالْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ - (النساء -٣٦)

এবং দাসত্ব কবুল কর এক আল্লাহ্‌র এবং তাঁর সাথে এক বিন্দু শির্ক করো না। আর পিতা-মাতার প্রতি কল্যাণ কামনা কর, কল্যাণ কামনা ও কল্যাণমূলক আচরণ কর নৈকট্য সম্পন্ন ব্যক্তি, ইয়াতিম ও মিসকীনগণ, নিকটাত্মীয়তা সম্পন্ন প্রতিবেশী, পার্শ্বে অবস্থানকারী প্রতিবেশী ও মিসকীনগণ, নিকটাত্মীয়তা সম্পন্ন প্রতিবেশী, পার্শ্বে অবস্থানকারী প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী সহচর-এর সাথে।

উদ্ধৃত আয়াতে প্রতিবেশীকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম আত্মীয় প্রতিবেশী। দ্বিতীয়, অনাত্মীয় প্রতিবেশী এবং তৃতীয় পাশাপাশি চলার সঙ্গী। আত্মীয় প্রতিবেশীর তিনটি দিক দিয়ে হক্ রয়েছে। তা হলো নিকটাত্মীয়তার হক্, প্রতিবেশী হওয়ার হক্ এবং মুসলিম হওয়ার হক্। অন্যান্য প্রতিবেশীর তুলনায় আত্মীয় প্রতিবেশীর হক্ তিনটি দিক দিয়ে, এইজন্য তার কথা সর্বাগ্রে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর হক্ দুটি দিক দিয়ে। একটি প্রতিবেশী হওয়ার হক্ আর অপরটি মুসলিম হওয়ার হক্ তৃতীয় পর্যায়ে পার্শ্বসাথী। সে হয়ত সফল সঙ্গী, কিংবা ঘরের সঙ্গে ঘর হওয়ার দিক দিয়ে অতি নিকটস্থ ও ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। অথবা লেখা পড়া বা কামাই-রোজগারের ক্ষেত্রে সে সঙ্গী, পাশাপাশি থাকা লোক। রাস্তা-ঘাটে চলার পথের পাশাপাশি চলা লোক বা মসজিদে নামাযে পাশাপাশি দাঁড়ানো যে কোন মজলিশে বসা—সেও প্রতিবেশী হিসাবে একটি হক্ রাখে এবং সে হক্‌ও অবশ্যই আদায় করতে হবে।

উপরোদ্ধৃত আয়াতে এইসব লোকের হক্ থাকার কথা ঘোষিত হয়েছে এই পর্যায়ে প্রথম কথা, আয়াতের শুরুতে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার ও তাঁর সাথে একবিন্দু শির্ক না করতে বলার পর এই হক্-এর কথা বলা হয়েছে। তার অর্থ, কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার ও তাঁর সাথে শির্ক না করার নীতি গ্রহণ করলেই বান্দার উপর এই হক্‌সমূহ আদায় করা অবশ্যই কর্তব্য হয়ে পড়ে। একমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দেগী কবুল করা ও তাঁর সাথে একবিন্দু শির্ক না করা

আল্লাহ্‌র হক্। আল্লাহ্ তাঁর নিজের দেয়া বিধানের সর্বত্রই তাঁর নিজের হক্-এর কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বান্দাদের পারস্পরিক যে হক্ ধার্য হয় তাও বলেছেন। এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ যেমন নিজের হক্ বান্দাদের নিকট থেকে যথারীতি ও পুরাপুরি আদায় করার পক্ষপাতী, তেমনি চান বান্দাদের পারস্পরিক হক্ ও যথারীতি আদায় হতে থাক। উক্ত আয়াতে পারস্পরিক সংস্পর্শে আসা লোকদের পরস্পরের উপর যে হক ধার্য হয়, তার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এই পর্যায়ে রাসুলে করীম (স) বিভিন্নভাবে এই পারস্পরিক হক্-এর কথা বলিষ্ঠ ভাষয় উপস্থাপিত করেছেন। একটি হাদীসে রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهٖ –

(بخری عن ابی شر یح الخزاعی)

যে লোকই আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তারই কর্তব্য প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করা—কল্যাণ করা।

প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ এবং তার কল্যাণ করার কাজটিকে মৌলিক ঈমানের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে এ হাদীসটিতে। তার অর্থ ঈমান থাকলে প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই করা হবে। আর যদি সে ভাল ব্যবহার করা না হয়, তাহলে ঈমান যথাযথভাবে আছে—তা মনে করা যাবে না। অনুরূপ আর একটি হাদীস হলঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهٗ –

(بخاری، عن ابی هریرة رض)

আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি যার ঈমান আছে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট বা পীড়া-জ্বালা-যন্ত্রণা না দেয়।

এ দুটি হাদীস ইতিবাচক ভঙ্গীতে বলা। নেতিবাচক ভঙ্গীতে বলা একটি হাদীস হল। রাসূলে করীম (স) পরপর তিনবার বললেনঃ

وَاللهِ لاَيُؤْمِنُ –

আল্লাহ্‌র কসম, সে ঈমানদার নয় ....

তিনবার বলা এই কথাটি শুনে সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেনঃ রাসূল, আপনি কার

কথা বলছেন? জবাবে তিনি বললেনঃ

اَلَّذِیْ لَا یَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ – (بخاری، مسلم عن هريرة رض)

আমি সেই ব্যক্তির কথা বলছি, যার নিপীড়ন ও জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপত্তা পায় না।

ইসলামে প্রতিবেশীর হক্-এর উপর অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাসূলে করীম (স) নিজে বলেছেনঃ

مَازَالَ جِبْرِیْلُ یُوْصِیْنِیْ بِالْجَارِ حَتّٰی ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَیُوَرِّثُهٗ

(بخاری–مسلم ابن عمروعائشة رض)

জিবরাইল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে বারবার নিরন্তর অসিয়ত করছিলেন এমনভাবে যে, আমি ধারণা করতে লাগলাম যে, সম্ভবত তাকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে।

বস্তুত প্রতিবেশীর হক্-এর উপর কত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হলে তাকে উত্তরাধিকারী বানানো হতে পারে বলে ধারণা হতে পারে, তা অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। উত্তরাধিকারী হয় সাধারণত রক্ত সম্পর্কের—বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। প্রতিবেশীর সাথে সেরূপ কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তার হক্কে এতখানি বড় করে দেখার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন সাংঘাতিক কারণ নিহিত থাকবে। এই হক্ আদায় করলে তা ঈমান না থাকার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং সে কারণে সে—প্রতিবেশীর হক্ যে আদায় করবে না।

لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ – (مسلم)

সে বেহেশ্তের প্রবেশ করতে পারবে না।

রাসূলে করীম (স) সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে বিষয়টির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষের বসতি পরস্পর সন্নিহিত হয়ে থাকে। তাদেরই পারস্পরিক হক্-এর উপর উপরোক্ত গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। কিন্তু সে পরস্পর সন্নিহিত বসতির পরিধি বা সীমা কতখানি? এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

كُلُّ اَرْبَعِیْنَ دَارًا جِیْرَانٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ وَعَنْ یَمِیْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ – (الطحاوي)

প্রত্যেক চল্লিশটি ঘর পরস্পরের প্রতিবেশী। প্রত্যেকের সম্মুখের পেছনের, ডানের ও বামের চল্লিশ ঘর।

প্রতিবেশীদের পারস্পরিক কি কি হক্ রয়েছে, তার ব্যাখ্যাও রাসূলে করীম (স) দিয়েছেন। একটি হাদীসে বলেছেনঃ

اَلْجَا رُاَحَقُّ بِشَفْعَتِه- (بخاري-مسلم)

প্রতিবেশী তার 'শুফ্য়া' পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী।

'শুফ্য়া' হলো জমি-ক্ষেত। অর্থাৎ কেউ যদি তার জমি-ক্ষেত বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত করে, তাহলে তা ব্যয় করার ব্যাপারে তার প্রতিবেশীই তুলনামূলকভাবে বেশী অধিকারী সম্পন্ন। কেননা সে জমি কোন দূরবর্তী লোক ক্রয় করলে নিকট প্রতিবেশীর পক্ষে অনেক কষ্টের কারণ হতে পারে।

অপর হাদীসে বলা হয়েছেঃ

حَقُّ الْجَارِ اِنْ مَّرِضَ عَدْ تَهُ وَاِنْ مَّاتَ شَيَّعْتَهُ وَاِنْ وَاِنْتَقَرَ اَقْرَ ضْتَهُ وَاِنْ اَعْوَزَ سَتَرْ تَهُ وَاِنْ اَصَا بَهُ خَيْرٌ هَنَّأْ تَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةً عَزَّيْتَهُ وَلَاتَرْفَعْ بِنَا ءَكَ فَيَقْ بِنَا ئِهِ فَتَسُدُّ عَلَيْهِ الرِّيْحَ وَلَا تُوْذِهِ بِرِيْحِ قِدْرِكَ اِلَّا اَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا - (الطبرانى)

প্রতিবেশীর হক্ হলো, সে যদি রোগাক্রান্ত হয় তাহলে তুমি তার সেবা শুশ্রূষা করবে। সে মরে গেলে তার লাশের সঙ্গে কবরস্থান পর্যন্ত যাবে—কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করবে। সে যদি অর্থাভাবে পড়ে, তাহলে তুমি তাকে ঋণ দেবে। সে যদি নগ্নতা-উলঙ্গতায় পড়ে তাহলে তুমি তার লজ্জা আবৃত করবে। তার যদি কোন কল্যাণ হয়, তাহলে তুমি তাকে মুবারকবাদ দেবে। সে যদি কোন বিপদে পতিত হয়, তাহলে তুমি তার দুঃখের ভাগ নেবে। সহানুভূতি জানাবে, তোমার ঘরকে তার ঘর থেকে উঁচু বানিয়ে তাকে মুক্ত বায়ু থেকে বঞ্চিত করবে না। তোমার রান্নার পাত্রের বাতাস দিয়েও তাকে কষ্ট দেবে না। যদি তেমন অবস্থা হয়-ই তাহলে তাকে এক চামচ খাবার পাঠিয়ে দেবে।

প্রতিবেশীর যে হক্সমূহ নবী করীম (স) চিহ্নিত করেছেন, তা শুধু পুরুষদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়, মহিলারাও প্রতিবেশী মহিলাদের সে সব হক্ আদায় করতে বাধ্য। তিনি মহিলাদের সম্বোধন করে বলেছেনঃ

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا - (بخاری، مسلم)

হে মুসলিম নারী সমাজ! কোন মেয়ে প্রতিবেশী যেন অপর মেয়ে প্রতিবেশীকে হীন-নগণ্য জ্ঞান না করে, যেন ঘৃণা না করে।

মানুষ তারই মত মানুষকে হীন নগন্য মনে করবে, ঘৃণা করবে, তা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র কিছুমাত্র পছন্দ নয়। সে পুরুষই হোক, কি হোক নারী। বিশেষ করে মানুষের প্রাথমিক সাধারণ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে পেট ভরা খাবার পাওয়া। কোন লোক এই খাবার থেকে বঞ্চিত থাকবে, আর তারই প্রতিবেশী পেট ভরে খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাবে আল্লাহ্ এবং রাসূল তা আদৌ পছন্দ করতে পারেন না। রাসূলে করীম (স) অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ

مَا اٰمَنَ بِىْ مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَّجَارُهٗ جَائِعٌ وَّهُوَ يَعْلَمُ - (البزار)

যে লোক পেট ভরে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রি যাপন করল এবং সে জানলো যে তার প্রতিবেশী না খেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান আনেনি।

অর্থাৎ একই বসতির পাশাপাশি অবস্থানকারী দুইজন লোকের একজন ক্ষুধায় কাতর হয়ে রাত্রি যাপন করবে, অপরজন পেট ভরে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রি যাপন করবে, তা ঈমানদার লোকদের কাজ হতে পারে না। না জানতে পারলে ভিন্ন কথা। কিন্তু জানবে যে, প্রতিবেশীর ঘরে খাবার নেই, আর এই অবস্থায়ও—বিশেষ করে রাত্রি বেলা যখন কোনখান থেকে খাবার যোগার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়—অপরজন খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে, তার অংশ প্রতিবেশীকে দেবে না। বা নিজের খাবার তার সাথে ভাগাভাগি করে খাবে না, ঈমানদার লোকদের ব্যাপারে একথা চিন্তাই করা যায় না।

ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক ও গোলাম-চাকরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দান

উপরোদ্ধৃত আয়াতে প্রতিবেশীদের সম্পর্কের কথা বলার পূর্বেই সমাজের ইয়াতিম ও মিসকীনদের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। ইয়াতীম সে, যে নাবালেগ বালক-বালিকার পিতা মরে গেছে। আর মিসকীন হচ্ছে, যাদের জীবিকার সম্বল নেই। সমাজের মধ্যে এই দুই শ্রেণীর লোক অত্যন্ত নাজুক অবস্থার সম্মুখীন। একটি পরিবারে পিতাই যদি একমাত্র উপার্জনকারী হয়, আর সে যদি অল্প বয়সের সন্তান-সন্ততি রেখে হঠাৎ মরে যায়, তাহলে এই পরিবারটির অবস্থা যে

কতখানি মর্মান্তিক হয়ে পড়ে, তা ভাবলেও শরীর শিউরে উঠে। অনুরূপভাবে যে লোকদের ঘরে খাবার নেই কিংবা প্রয়োজন মত উপার্জন নেই, সে পরিবারটির অবস্থাও অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়বিদারক হয়ে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এরাও মানুষ। এই নিয়ামত ভরা পৃথিবীতে যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে সুখে-সাচ্ছন্দে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। অধিকার রয়েছে পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের। তাই তারা যাতে করে মানবিক অধিকার ও মর্যাদা পেতে পারে, সেজন্য আল্লাহ্র বিধানে তাদের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তারা সমাজে দুর্বল ও অসহায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজের উপর তাদের হক্ রয়েছে। সমাজ সে হক্ আদায় করতে বাধ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের মানবিক ও সামাজিক হক্ যথাযথ আদায় হওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। যে পথিক পথের সম্বলহীন হয়ে পড়েছে এবং যারা দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী ও অন্যদের চাকর হিসেবে কাজ করতে বাধ্য, তারাও সমাজের অসহায় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদেরও মানবিক ও সামাজিক অধিকার রয়েছে। অতএব, সে অধিকারও যথাযথভাবে আদায় হতে হবে।

এই লোকদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দানের নির্দেশ দিয়ে আয়াতের শেষে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا -

অহংকার-গৌরবকারী দাম্ভিক লোকদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না—ভালবাসেন না।

অর্থাৎ যারা তাদের নিকটাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশীর লোক এবং সমাজের অসহায় ইয়াতীম-মিসকীন নিঃস্ব পথিক ও শ্রমজীবী, চাকর-চাকরাণী প্রভৃতির যে হক্ রয়েছে তা যথাযথ আদায় করে না, তাদের মুকাবিলায় অহংকার গৌরব করে, আর তাদেরকে ঘৃণা করে, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তারা কখনই আল্লাহ্র ভালোবাসা পেতে পারে না, তারা আল্লাহ্র পছন্দনীয় লোক নয়।

কুরআন মজীদে সমাজের এসব দুর্বল-অক্ষম-অসহায় লোকদের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাদের এই বঞ্চিত-দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা থেকে মুক্তিদানের জন্য কার্যত বাস্তবায়নের পন্থা উদ্ভাবন করেছে এবং সে পন্থাকে কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে।

উপরে যেসব শ্রেণীর লোকদের হক্ আদায় করতে বলা হয়েছে, পরিণতিতে তা সকলের প্রতি সকলের হক্ বা অধিকারের ব্যাপার। তা সকলকেই

আন্তরিকতার সাথে যথাযথ আদায় করতে বলা হয়েছে। এই নির্দেশ যদি সকলেই পালন করে, তাহলে সমাজের কোন ব্যক্তিই তার ন্যায্য হক্ পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে না। প্রত্যেকেই নিজের হক্ পেয়ে যাবে।

সকল মানুষের প্রতি সকল মানুষের যে হক্ আছে, তাই সকল মানুষের প্রতি সকল মানুষের কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের জন্য ইসলামে বিশেষ তাকীদ রয়েছে। তোমার হক্ অন্যান্য মানুষের প্রতি রয়েছে, এ কথা তুমি ভুলে যেও না। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মানুষের প্রতি তোমার যে কর্তব্য রয়েছে তা যথাযথভাবে পালন কর। তাহলেই হক্ পেয়ে যাওয়া ও কর্তব্য পালন হওয়া একই সময় সম্পন্ন হয়ে যাবে। হক্ পাওয়ার জন্য কারোরই কোন লড়াই-ঝগড়া করার প্রয়োজন দেখা দেবে না। অথচ সকলেই নিজ নিজ হক্ পেয়ে যাবে, কোন লোকই নিজের হক্ পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে না।

অধিকার আদায় ও কর্তব্য পালনে ইসলামের এই ভূমিকা একটি তুলনাহীন বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার অপর কোন ব্যবস্থাই এই দিক দিয়েও ইসলামের সাথে তুলনীয় হতে পারে না।

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়েবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সুদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ)-এর বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)' ও 'ইসলামে হালাল হারামের বিধান', মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাসসাসের ঐতিহাসিক তফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থটি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)